Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

সপ্তম বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖মার্চ ২০১৭

মঙ্গলের আকাশ

গ্রহদের আকাশ

বুধের আকাশ

চাঁদের আকাশে আমাদের পৃথিবী

◆প্রাইভেট চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন – সুচিকিৎসার দুয়ার খুলবে কি ?

◆জীবনের উৎপত্তি - বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ ও ধর্ম – এ. আই ওপারিন

শনির আকাশ

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	প্রাইভেট চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন – সুচিকিৎসার দুয়ার খুলবে কি ?	৩
সমাজ দর্পণ ঃ	ধর্ম-জাত-সম্প্রদায়-ভাষার ভিত্তিতে ভোট এদেশে নিষিদ্ধ হবে কী ?	৪
	পূর্ব মেদিনীপুরে নরবলি – এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের শেষ কোথায়?	৫
কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা? ঃ	রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী ঃ ‘গো-মাতা’ ... নিশ্বাসের সাথে অক্সিজেন ছাড়ে!	৭
	তেলেঙ্গানা রাজ্য হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেয়ে সরকারি টাকায় মন্দিরে মন্দিরে গয়না প্রদান	৭
	হিন্দুত্ববাদী ফতোয়া ঃ রানাপ্রতাপের কাছে আকবরের হার হয়েছিল!	৮
	‘নোয়া-র নবতরণী’	৯
জানা-অজানা ঃ	গ্রহদের আকাশ	১০
	প্রাণীজগতে রঙের বাহার	১৩
খোলা জানালা ঃ	জীবনের উৎপত্তি বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ ও ধর্ম – এ. আই ওপারিন	১৯
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	‘বাণিজ্যিক স্বার্থে’ ইসরো-র গগণচুম্বি সাফল্য	২৫
	মানবদেহের মেসেন্টারি নতুন অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেল	২৬
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩০
পাঠকের কলম ঃ	গীতা কি জাতীয় গ্রন্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়?	৩৪
জিজ্ঞাসা ও তার সমাধান ঃ	সুনামি কি ও কেন?	৩৬
সমীক্ষা ঃ	রাজমহলের লালমাটিয়া খনিতে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু কেন?	৩৮
সংগঠন সংবাদ ঃ	বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ’র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল	৪০
	জেলায় জেলায় বিজ্ঞান মনস্ক’র কর্মসূচী	৪৩
রিপোর্ট ঃ	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের দাবিতে গণআন্দোলনের সাথী বিজ্ঞান মনস্ক	৪৪
	বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৩তম বার্ষিক সম্মেলন	৪৫
	ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের পঞ্চম কেন্দ্রীয় সম্মেলন	৪৬

সম্পাদকীয়

প্রাইভেট চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন

সুচিকিৎসার দুয়ার খুলবে কী ?

কেমন আছেন? এ প্রশ্নের বহুমুখী উত্তরের প্রধান দুটি দিক হল শরীর স্বাস্থ্য এবং জীবিকা। পুঁজিবাদী সমাজে এ দুটি আবার সমানুপাতিক সম্পর্কে যুক্ত। কারণ জীবিকার উপর নির্ভর করে খাদ্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেনার ক্ষমতা কার কতটা! অন্য সবকিছুর মত স্বাস্থ্য নামক পণ্যটিও বাজারে হরেক রকমের পাওয়া যায়। যার যেমন পকেটের জোর সে তাই কেনে! শুধু আমাদের রাজ্য নয়, সারা দেশ, সারা বিশ্ব–ছবিটা প্রায় একই।

পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কি করবেন? কোথায় যাবেন? একদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলির সাফল্যের বিজ্ঞাপণ, টাকা ফেললেই বেড মেলার আশ্বাস! মফস্বল বা কলকাতায় মনপসন্দ না হলে ভেলোর অথবা মুম্বই! আর পকেটে জোর না থাকলে মুমূর্ষু রুগী নিয়ে সরকারি হাসপাতালের দরজায় দরজায় বেডের প্রত্যাশায় ঘোরা। নানা জায়গায় 'রেফার' হয়ে তারপর ট্রলিতে বা বারান্দার মেঝেতে ঠাঁই মিললেও নেতা-মন্ত্রী না ধরলে চিকিৎসা আদৌ কি মিলবে কারও জানা নেই! সরকারি হাসপাতাল আর মেডিকেল কলেজগুলিতে জুনিয়র ডাক্তাররা চিকিৎসাবিদ্যায় হাত পাকান, আর সিনিয়র ডাক্তাররা অধিকাংশই সরকারি আজ্ঞা পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। যেমন ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া-এনসেফেলাইটিসে মৃত্যুর কথা ডেথ সার্টিফিকেটে লেখার অধিকার নেই...। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার এবং পরিকাঠামোর তুলনায় রুগীর সংখ্যা কখনও সখনও হাজার ছাড়িয়ে যায়। গ্রামীণ/ব্লক/মহকুমা হাসপাতালগুলির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলাই বাহুল্য!

রাজ্যপাট বদল হওয়ার পর সরকারি ক্ষেত্রে উপরিকাঠামোয় অনেক বদল ঘটেছে। অনেক নতুন ঘরবাড়ি হয়েছে, রঙ-চঙ করে সাজানো হয়েছে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা হয়েছে, রুগীর পরিবারের জন্য আশ্রয়স্থল বনেছে আর হয়েছে বিশেষ বিশেষ কোম্পানিকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার জন্য তথাকথিত 'ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান'।

আর বেসরকারি ক্ষেত্রে! সাধ আর সাধ্যের বিরোধ অতিক্রম করেও বহুক্ষেত্রে বাড়ি ফেরে লাশ! কিংবা বকেয়া বিল মেটাতে না পারায় সেই লাশ ঘরে আনার অধিকার হারান কেউ কেউ। একাধিকবার একই পরীক্ষা, প্রয়োজনের তুলনায় বহুগুণ ওষুধের বিল এমনকি মৃত রুগীকেও ভেনটিলেশনে রেখে বিল চড়ানো...এসবই নিত্যদিনের ঘটনা। দু দশক আগেকার মণিকাঞ্চনের কথা অনেকের স্মৃতিতেই আবছা হয়ে গেছে। তবে আজকের দিনের সঞ্জয় রায়রা সেই স্মৃতিকে বার বার উস্কে দেয়। বহুকাল ধরে এমন চললেও সাম্প্রতিককালে যেন হই চই বেশি হল! কিন্তু কেন?

উত্তর পেতে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি রাজ্যবাসীকে। গত ৩রা মার্চ রাজ্য বিধানসভায় **ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন এন্ড ট্রান্সপারেন্সি) বিল ২০১৭** পাশ হয়ে গেল সর্বসম্মতিতে। বিরোধী দলের অভিযোগ ২০১০ সালে আনা পুরানো বিলকেই কপি করে রাজনৈতিক ফয়দা নিচ্ছে বর্তমান সরকার।

নতুন আইনে সরকার কমিশন গঠন করেছে, যার মর্যাদা সিভিল কোর্টের ন্যায়। এই কমিশন দুর্নীতি প্রমাণ হলে চিকিৎসাকেন্দ্রকে ৫০ লক্ষ টাকা অবধি ক্ষতিপূরণ, লাইসেন্স বাতিল এবং/অথবা ৩ বছর অবধি হাজতবাস করাতে পারবে। আইন অনুযায়ী প্রাইভেট হাসপাতাল বা নার্সিং হোম পথ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত বা ধর্ষিতার চিকিৎসা করাতে বাধ্য থাকবে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে পারবে না, রুগীর পরিবার অর্থের যোগান দিতে ব্যর্থ হলে চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না, জরুরিকালীন ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় জীবনদায়ী ওষুধ দিতে হবে এবং যেখানে ১০০-র অতিরিক্ত বেড আছে সেখানে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান এবং ডায়গনস্টিকস্ খুলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি হাসপাতালের মালিকদের বৈঠকে তাদের ব্যবসা করতে বললেও অমানবিক হতে বারণ করেছেন! বৈঠকে অনেক মালিক বলেছেন তারা নাকি ইতিমধ্যেই এমন পরিষেবা দিয়ে থাকেন! অতএব মমতাময়ী কায়দায় জনরোষ আপাতত স্তব্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন হল ২০১০ সালে পূর্বতন সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিল কেন আর বর্তমান সরকার তা রূপায়ণ করল কেন? অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ আইন হচ্ছে কেন?

প্রথমতঃ তথাকথিত জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে 'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই আওয়াজ ভোঁতা করতে এ এক মোক্ষম দাওয়াই। বিনে পয়সায় সরকারি চিকিৎসা যা দিচ্ছে তাই ঢের বেশি! এর বেশি চেও না। নিঃস্ব মানুষকে এই নিয়েই খুশি থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের আইন করার দীর্ঘদিনের দাবি ছিল

●*সম্পাদকীয়'র শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

সমাজ দর্পণ

ধর্ম-জাত-সম্প্রদায়-ভাষার ভিত্তিতে ভোট এদেশে নিষিদ্ধ হবে কী ?

গত ২রা জানুয়ারি ২০১৭ জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারা অনুযায়ী প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তিরথনাথ সিং ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক বেঞ্চ ৪-৩ ভোটে ২১ বছর ধরে ঝুলে থাকা মামলার রায় দিল। রায়ে বলা হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারা অনুযায়ী **ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোটাদের ভোট দিতে বা না দিতে আবেদন করা বদ ও হানিকর কাজ সুতরাং অবৈধ।**

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মুম্বই বিধানসভা নির্বাচনে সান্তাক্রুজ কেন্দ্রে বিজয়ী হন বিজেপি প্রার্থী অভিরাম সিং। পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী সি ডি কমাচেন ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভোটে বিজয়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্টে মামলায় অভিযোগ করেন ভোটের প্রচারে বি জে পি প্রার্থী প্রার্থী ও তার দল এবং শরিক শিবসেনা হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট অভিরামের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে। অভিরাম সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে। এই মামলা ফয়সালা হওয়ার আগেই সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৬ সালে ডঃ রমেশ যশবন্ত প্রভু বনাম প্রভাকর কুন্তে মামলায় রায় দেয় **"হিন্দুত্ব/হিন্দুবাদ কোন ধর্ম নয়, এক জীবনধারা (a way of life)"**।

হিন্দুত্ববাদীরা তারপর থেকে তেজী হয়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালে বি জে পি নির্বাচনী ইস্তেহারে লিখেছিল "শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টও হিন্দুত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা মেনে নিল।" এই প্রচার এখনও তারা করে থাকে। প্রচারে বলা হয় এদেশের সকলেই জন্মগতভাবে হিন্দু। যারা পরে অন্য ধর্ম নিয়েছে তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই রায়ে পুর্ণর্বিবেচনার জন্য শ্রীমতী নীলা গোখলে, শ্রীমতী বীণা গুপ্তা, শ্রীমতী পাতোদিয়া প্রমুখরা আবেদন করেন। যা এখনও কোর্টে ঝুলে আছে।

এই অবস্থায় নির্বাচনে ধর্মের ভিত্তিতে প্রচার সম্পর্কিত মামলাগুলিকে একসূত্রে গেঁথে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ২০১৩ সালে ৫ সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করেন। এর শুনানির সময় ১২৩(৩) ধারাতে বিবৃত শব্দ "তার (his)" এর ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এই বেঞ্চ তা ৭ সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে পাঠায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

সবশেষে ২রা জানুয়ারি ২০১৭ চূড়ান্ত রায় হল। কিন্তু এই বেঞ্চ "হিন্দুত্ব/হিন্দুবাদ কোন ধর্ম নয়, এক জীবন ধারা" এই বিবদমান রায় পুর্ণর্বিবেচনা না করে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট প্রচার করার বিষয়টিকেই বিচার্য বিষয় করেছিল। ফলে পুনর্বিবেচনার জন্য যারা মামলা করেছিলেন তারা হতাশ। এর আগে এনজিও কর্মী শ্রীমতী তিস্তা সেতলবাদ ২০১৬'র অক্টোবরে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ঐ সাংবিধানিক বেঞ্চের কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পুনর্বিবেচনা করার এবং মামলায় তাঁকে একটি পক্ষ করার আবেদন করেছিলেন। তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ঐ বেঞ্চ জানায় তাঁদের 'একমাত্র বিচার্য বিষয় কোনো ধর্মের নামে ভোট দেওয়া-নেওয়ার আবেদন আইনসম্মত কিনা। কোন ধর্মের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা নয়।'

অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি ২০১৭, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের এই রায় মূল প্রশ্নটি ফয়সালা না করে ঝুলিয়ে রেখেছে, যেমন রাম মন্দির/বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে মামলার মূল প্রশ্নটি।

১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় "হিন্দুত্ব/হিন্দুবাদ কোন ধর্ম নয়, একটি জীবন ধারা" এখনও বহাল আছে। এখন এই তথাকথিত "সনাতন বিচার ধারা" এদেশের সকলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে প্রচার আইনী বৈধতা নিয়ে চলছে। এই তথাকথিত "জীবন ধারা" পালন না করা দেশদ্রোহিতা/রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলা হচ্ছে। দেশজুড়ে অহিন্দু (বিশেষতঃ মুসলমান) এবং শুদ্র জনতার উপর চলছে প্রকাশ্য উৎপীরণ। চলছে পুরুষতন্ত্রকে ন্যায্যতা প্রদান। রাষ্ট্র তথাকথিত সেকুলারবাদী মুখোশ পড়ে বোবা-কালা সেজে আছে।

ডিসেম্বর ২০১৫ (পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা ২) সংখ্যায় বলা হয়েছিল "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আচরণ মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আচরণে বাধ্য নয়।" রাষ্ট্রের নীতি এবং রাজনেতাদের আচরণ দেখলে এটাই স্পষ্ট হয়।

এখন ২রা জানুয়ারির রায়ের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। এই রায় কি বাস্তবে লাগু হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে? এর কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ প্রথমতঃ জাত-পাতের ভিত্তিতে দেশে লোকসভা/বিধানসভা বা অন্য ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্তো আছে, সরকারি চাকুরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ চালু আছে। জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনও আইন সিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ দেশের মানুষকে সরকারি/বে-সরকারি ক্ষেত্রে ফরম ভর্তি করতে হলে জাত/ধর্মের উল্লেখ করতে হয়। ফর্মে রিলিজিয়ন অংশটিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু-ই লেখেন (অথচ তা নাকি ধর্ম নয় বিচার ধারা!)। অর্থাৎ ধর্ম-জাত-ভাষা-সম্প্রদায়ের পরিচয়েই মানুষকে বিচার করা হয়। তৃতীয়তঃ দেশের জনগণনা

এবং অন্য সমস্ত সরকারি অনুসন্ধানে জনসংখ্যার কত অংশ হিন্দু/মুসলমান/শিখ/খ্রিস্টান/বৌদ্ধ/জৈন ইত্যাদি আছে তার হিসাব পেশ হয়। রাজনৈতিক দলগুলি ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়-ভাষার জনগণের হিসাব কষে ভোটে প্রার্থী ঠিক করেন। নির্বাচনে সেই হিসাবেই প্রচার হয়। টি.ভি, রেডিও, সংবাদপত্র সর্বত্র ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সম্প্রদায়-জাত অনুসারে কোথায় কারা শক্তিশালী তার বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট দেয়। প্রার্থীরা একে অপরকে হিন্দুত্ববাদী/মুসলীম তোষণকারী/দলিতপন্থী/অমুক সম্প্রদায় ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছেন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। ভোটের সময় মন্দির/মসজিদ/অন্য ধর্মস্থান থেকে নির্দিষ্ট দল/ প্রার্থীকে ভোট দিতে বা না দিতে বলা হচ্ছে প্রকাশ্যে।

সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেকুলারবাদের ছদ্ম মুখোশ পড়ে জাত-ধর্ম-ভাষা-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট হচ্ছে এবং হবে। এই ভিত্তিতেই মানুষকে বিভক্ত রেখে পুঁজিবাদ শাসন শোষণ চালিয়ে যাবে। এই কাঠামোতে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কল্পনা অবাস্তব। ■

পূর্ব মেদিনীপুরে নরবলি – এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের শেষ কোথায়?

'তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভের আশায় এক তরুণীকে বলি দেওয়া হয়েছে' – এমন এক চাঞ্চল্যকর খবর গত ১৯শে অক্টোবরের প্রায় সব বাংলা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের নীলকুণ্ঠা গ্রামে। তন্ত্রসাধক হলেন রামপদ মন্ডল ওরফে তপন, আর বলির পাঁঠা হলেন বাগুইআটির পার্বতী সরদার। গোয়েন্দা পুলিশের তদন্ত এবং খবর বিক্রি করা সংস্থাগুলির দু-তিন দিনের ধারাবাহিক বিবরণ থেকে জানা গেছে যে মৃতার দিদি পূর্ণিমা বিশ্বাস এবং দুই বৌদি টুকটুকি সরদার ও প্রীতি সরদার এই হত্যাকান্ডে জড়িত। জেলা পুলিশ সুপার আলোক বাজোরিয়ার কথায় কাপালিক রামপদ একদিকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ হবার ইচ্ছায়, অন্যদিকে পার্বতীকে পৃথিবী থেকে সরানোর বিনিময় একটা ফ্ল্যাট পাওয়ার লোভে একাজ করেছে। রামপদ'র ব্ল্যাক ম্যাজিক তথা তুকতাক্, মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা বান মারা, বশীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাজিমাত করার আশ্বাস – সরদার পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিল। গত কয়েক মাস যাবৎ সে সরদার পরিবারের বাড়িতেই প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার সমাধানের বিধান দেওয়া শুরু করেছিল। খবরে প্রকাশ রামপদ'র বাড়ি থেকে তুক্‌তাক্, বশীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর বই-পত্র পূজার উপকরণ পাওয়া গেছে। পুলিশের জেরায় উঠে এসেছে যে গত কয়েক মাস ধরেই সে নরবলির পরিকল্পনা করেছিল। কেননা সে তন্ত্র বইয়ে পড়েছিল যে বলির রক্ত নিয়ে একটি মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলেই সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হবে। তবে এই ঘটনাকে বলি বলা হলেও পার্বতীকে শ্বাস রোধ করে, ছুরি দিয়ে দেহ থেকে মুন্ডু ছেদ করা হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় ৫০-৫৫ বছর আগে এই তমলুকেই তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে বাপ ছেলেকে বলি দিয়েছিল। আজও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নরবলির খবর পাওয়া যায়।

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আরও এক তান্ত্রিক সুপ্রিয় চক্রবর্তী ও তার সহকারী নিমাই মন্ডলকে হাওড়ার শ্যামপুর থানার পুলিশ প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। হাওড়ার শ্যামপুর থানার গড়চুমুক বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী সুদর্শন ধাড়ার মেয়ে ৭ বছর আগে বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। সেই মেয়েকেই বশীকরণের মাধ্যমে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য সুদর্শন বাবু যোগাযোগ করেছিলেন তান্ত্রিক সুপ্রিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। তান্ত্রিক সুপ্রিয় চক্রবর্তী তারাপীঠ শ্মশানে চন্ডালের মাথার খুলির আসনে বসে তন্ত্র সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে প্রচারিত। গত চার বছর ধরে তান্ত্রিক সুপ্রিয়'র প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সুদর্শন বাবুর মনে প্রতারিত হওয়ার সন্দেহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যার পরিণতি হলো তান্ত্রিক সুপ্রিয় ও তার সহকারী নিমাই এর হাজত বাস।

সুদর্শন বাবুর মতন অনেকেই নিজেদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বহু ভন্ড তান্ত্রিকদের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেও, তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ পুরুষদের দ্বারা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন এবং তা প্রয়োগও করেন।

কিন্তু কেন?

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলি না জানা থাকায় অলৌকিক শক্তির ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সেই ধারণার প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। তথাকথিত অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট করে স্বার্থ সিদ্ধ করার উপায়স্বরূপ তথাকথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব। এই সিদ্ধ পুরুষরা অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাতে পারে বলে কল্পিত। যা কেবল তারাই পারে, অন্য কেউ পারে না। কারণ এই সব সিদ্ধপুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ ঘটে তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে। ঐতিহাসিক যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তির পরেও তন্ত্র সাধনার বিলোপ হয়নি।

বিলোপ হয় নি বলি দেবার প্রথার। বরঞ্চ প্রায় প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রথা রয়ে গেছে।

নরবলি সাধারণত বালক তথা পুরুষদেরই দেওয়া হতো। তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুবতীদের বলি দিয়ে সেই রক্ত চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়াও হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "রাজর্ষি" উপন্যাসে নরবলি-র বিরোধিতা করলেও তিনি কিন্তু বলির উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করে সিদ্ধি লাভ করার অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক পথের বিরোধিতা করেন নি স্পষ্ট ভাষায়।

অধিকাংশ মানুষ, সমাজের কারণে ব্যক্তির জীবনের সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যারূপে দেখতে শেখার শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তারা সমস্যাগুলিকে ব্যক্তিগত সমস্যা রূপে চিহ্নিত করে এবং ব্যক্তিগতভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করে। উল্লিখিত ঘটনা দুটিতে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে সকলের অলক্ষ্যে এই সব তথাকথিত ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের একটি বিবেচিত উপায় হলো তন্ত্রসাধকের শরণাপন্ন হওয়া। একমাত্র অলৌকিক শক্তিধারী তন্ত্র সাধকই নিরুপদ্রপে সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। এই ধারণা আজকের যুগেও জনমানসে টিঁকে আছে শুধু ধর্মবাদীদের জন্য নয়। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রও এই অবৈজ্ঞানিক, হীন প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে পরোক্ষে মদত দেয়। দেশ নেতা, তথাকথিত সেলিব্রেটিরাও এর প্রচার করে। খবরের কাগজ, টেলিভিশনের পর্দায় নিয়মিত ব্ল্যাক ম্যাজিক, তন্ত্রসাধনার বিজ্ঞাপণ প্রচার হয়। এই জঘন্য কারবারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নামলে তাদের উপর হয় হামলা। নরেন্দ্র দাভোলকর মহারাষ্ট্রে ব্ল্যাক ম্যাজিক নিষিদ্ধকরণের জন্য আন্দোলন করলে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বোবা-কালা সেজে বসে আছে। সুতরাং এর অবসানের জন্য এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন লাগুর দাবির পাশাপাশি এর উৎস শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজের অবসানের লক্ষ্যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। ■

●*সম্পাদকীয়'র শেষাংশ*

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বীমা কোম্পানিগুলির। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রায় সব রাজ্য সরকার তার শ্রমিক-কর্মচারিদের স্বাস্থ্য বীমা করিয়েছে। বড় সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলিও তাই। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবীমার রমরমা কারবার। কিন্তু বীমা কোম্পানিগুলির প্যাকেজ থেকে বহুগুণ বিল বানাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমগুলি। থাকছে নানা ছলচাতুরি। রুগীর বিল কমলে, দুর্নীতি কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ হলে স্বাস্থ্যবীমার বাজার বাড়বে বহুগুণ। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যবসার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বীমা কোম্পানিগুলির হাতে। এদেশের বাজার আরও শক্তপোক্ত করতে এই সরকারি আইন তাই অতি জরুরি পদক্ষেপ। অনেকেরই জানা আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বীমা কোম্পানিগুলিই ক্যানসারের চিকিৎসা সহ জীবনদায়ী ওষুধের দর কমানোর জন্য সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করেছিল।

একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই একমাত্র অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার মতো চিকিৎসা তথা বিজ্ঞানের সুফল সকলের ভোগ করার অধিকার থাকে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মানুষ এই অধিকার অর্জন করেছিল। মুনাফার জন্য নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, প্রকৃত গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ার যে প্রয়াস সেখানে শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস আজও জাজ্বল্যমান। দুনিয়া আজ সমাজতন্ত্রের দুয়ারে প্রবেশ করেছে। শোষণ শাসন উৎখাত করে সেই সমাজ গড়তে পারলেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ, সুচিকিৎসার দুয়ার খুলতে পারে, প্রাইভেট চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আইন করে নয়।■

চিঠিপত্র ঃ

মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় সমীক্ষণে সম্পাদকীয় কলামে জাতীয়তাবাদের উপরে যে নিবন্ধ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আমি একমত। এখানে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলতে চাই যে আমাদের দেশে ব্রিটিশ বিরোধী যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল তা এক বিশেষ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাভারকর, গোয়ালকর ইত্যাদি। এর বাইরে অন্য জাতীয়তাবাদ ছিল যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নেতাজী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি। তাঁরা অন্য জাতীয়তাবাদের কথা বলতেন।

সঈদ আখতার হুসেন
(ই-মেল মারফৎ)

বইটা একটু মোটা করলে ভালো হতো।

দীপঙ্কর সরকার
(ই-মেল মারফৎ)

কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ?

রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী বললেন 'গো-মাতা'-ই একমাত্র প্রাণী যে নিশ্বাসের সাথে বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে!

রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী তথা পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী শ্রী বাসুদেব দেবনানী দাবি করেছেন যে প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র গোরু-ই এমন এক বিরল প্রাণী যে কিনা "প্রশ্বাসের সময় বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয় এবং নিশ্বাসের সময়ও অক্সিজেন ছাড়ে!"

গত ১৪ই জানুয়ারি রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে যে উক্ত শিক্ষামন্ত্রী হিংগোনিয়া গো সংরক্ষণ কেন্দ্র, অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশনের এক সভায় বলেন "গাই একমাত্র প্রাণী হ্যায় যো অক্সিজেন গ্রহণ করতী হ্যায় অউর অক্সিজেনই ছোড়তী হ্যায়।" তিনি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন "গোরুর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি গোরুর এই বৈশিষ্ট্যের কথা দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও খুব জরুরি।" তিনি বলেন "যদি কেউ গোরুর কাছে থাকেন তবে তার ঠান্ডা লেগে সর্দি হলে তা কমে যায়।" তিনি আরও দাবি করেন যে গোরুর গোবরে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি রয়েছে যা কিনা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শোষণ করতে সক্ষম"

যদিও গবাদি পশু সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) তাদের দ্বারা প্রকাশিত ২০০৬ সালের এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে, গোরু সহ সমস্ত গবাদি পশু বিপুল পরিমাণে গ্রিণ হাউস গ্যাসের উৎস। গবাদি পশুর পরিপাক পদ্ধতি এবং সার ইত্যাদি থেকে বিপুল গ্রিণ হাউস গ্যাস নির্গত হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে "গবাদি পশুগুলিই বিশ্বের ১৮ শতাংশ গ্রিণ হাউস গ্যাস নির্গমণের কারণ যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটায়। গাড়ি, এরোপ্লেনসহ বিশ্বের সকল ধরণের যানবাহন থেকে যে পরিমাণ গ্রিণ হাউস গ্যাস নির্গত হয় তার যোগফলের চেয়েও এটা বেশি।"

যাই হোক, প্রবাদ আছে 'গল্পে গোরু গাছেও চড়ে!' বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীদের পাল্লায় পড়ে নতুন প্রবাদ বাক্য রচনার সময় এসেছে। তবে প্রাচীনকালে প্রবাদ রচনায় বিজ্ঞানকে আশ্রয় করার প্রয়োজন পড়ত না। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা অভিজ্ঞতার ব্যাঞ্জনা প্রকাশ করতেন। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ রাখতে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের প্রচার প্রসার বাড়ছে। সাধারণ মানুষ যেখানে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে কুসংস্কারের প্রাচীর ভাঙতে উদ্যত তখন শাসকশ্রেণী ও তার বুদ্ধিজীবীরা কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর মজবুত করতে ময়দানে।■

(সূত্র ঃ হিন্দুস্থান টাইমস্ - ই নিউজ ১৬/০১/২০১৭)

তেলেঙ্গানা নতুন রাজ্য হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেয়ে মন্দিরে মন্দিরে সরকারি টাকায় গয়না প্রদান

পৃথক রাজ্য তেলেঙ্গানার দাবিতে নাকি অনেক ঘাম ঝরিয়ে ছিলেন তিনি! বার বার দিল্লীতে দরবার, হায়দরাবাদ এবং অন্যত্র বিক্ষোভ, আন্দোলন, অনশন কি করেন নি তিনি এবং তার দল! এতেই শেষ নয়, দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে রীতিমত মানত করেছিলেন নতুন রাজ্যের দাবিতে।

অবশেষে ২০১৪ সালে সৃষ্টিকর্তা (না কি কেন্দ্র সরকার!) তাঁর দাবি পূরণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন টি আর এস নেতা কে চন্দ্রশেখর রাও। কিন্তু মানতের কথা ভোলেন নি জননেতা চন্দ্রশেখর! সরকার গড়েই তিনি অন্ধ্র এবং নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানাসহ দক্ষিণের নানা মন্দিরে সপরিবার এবং সপারিষদ 'পূজা' দেওয়া শুরু করেন।

শুধু পূজো দেওয়াই নয় কোটি কোটি সরকারি কোষাগারের (অর্থাৎ জনতার) টাকায় মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের মূর্তিতে সোনার গোঁফ, মুকুট, নেকলেস, নথ ইত্যাদি নিবেদন শুরু করেছেন। তিরুপতি মন্দিরে আরাধ্য বালাজির জন্য একটি সোনার মুকুট, পদ্মাবতীর জন্য সোনার নথ; কুরভীতে বীরভদ্রস্বামীর জন্য সোনার গোঁফ; বরঙ্গলে ভদ্রকালী মন্দিরে ১২ কেজি ওজনের সোনার মুকুট; তিরুমালার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে সোনার মুকুট ও নেকলেস এবং বিজয়ওয়াড়ার কনকদুর্গা মন্দিরে দেবতার নাকের নথ দিয়েছেন তিনি।

জনগণের করের টাকায় কোটি কোটি টাকার এইসব স্বর্ণলঙ্কার তৈরির অর্ডার পেয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু

এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। ঘন ঘন মানত পূরণে কম ঘাম ঝড়ছে না মুখ্যমন্ত্রীর! তাই তো মাঝেমধ্যে বিশ্রাম দরকার তাঁর। সরকারি টাকায় হায়দরাবাদের প্রাণকেন্দ্রে ৯ একর জমির উপর ৫০ কোটি টাকায় নির্মিত আবাসন বানিয়ে বিশ্রাম নেন তিনি। এর মধ্যে আছে ২৫০ আসনের বিনোদন হল। কিছু সিনিয়র অফিসার এবং তাদের দফতরকেও সেখানে তুলে এনেছেন তিনি।

'মঙ্গলময়' তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন বলে তিনিও তাঁদের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করতে রাজী নন! নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলেছে এসব জনগণের টাকায় কেন? ঈশ্বর তেলেঙ্গানার জনতার দাবি মিটিয়েছেন তাই জনতার প্রতিনিধি হয়েই তো তিনি একাজ করছেন! ■

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার ই পেপার ২১/০২/২০১৭, এই সময় ১১/০২/২০১৭)

হিন্দুত্ববাদী ফতোয়া
ইতিহাস যাই বলুক! বলতে হবে হলদিঘাটের যুদ্ধে রানাপ্রতাপের কাছে আকবরের হার হয়েছিল!

হলদিঘাটের যুদ্ধে কে কাকে হারিয়েছিল? সকল ঐতিহাসিকদের মত ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের বাহিনীর সামনে রাজপুত রাজা রাণাপ্রতাপ সিং পরাজিত হয়ে দক্ষিণ মেবারের পাহাড়ে আশ্রয় নেন।

কিন্তু রাজস্থান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্তোর স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যে বই পড়বেন তাতে লেখা থাকবে হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবর নয়, রানাপ্রতাপ জয়ী হয়েছিলেন।

শাসক দলের বিধায়ক ও রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মোহনলাল গুপ্তা এইভাবে নতুন করে হলদিঘাটের যুদ্ধের ইতিহাস লেখার প্রস্তাব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজেশ্বর সিং জানিয়েছেন যে বিধায়কের প্রস্তাব বোর্ড অব স্টাডিজ-এর কাছে বিবেচনার জন্য পাঠান হয়েছে। তারাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কালীচরণ সরাফ দাবি করেন "আকবর বিদেশী আক্রমণকারী, আদতে রাণা যুদ্ধে জিতেছিলেন এই সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইতিহাসের ভুল তথ্য কয়েক প্রজন্ম ধরে পড়ানো হয়েছে। যদি এখন ইতিহাস সংশোধন করে রানাপ্রতাপকে জয়ী হিসাবে দেখানো হয়, তাতে দোষের কী আছে?" স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বাসুদেব দেবনানী এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন "হলদিঘাটে রাণাই জয়ী হয়েছিলেন, এতে কোন ভুল নেই। তবে আপাতত স্কুল পাঠ্যে বদল করা হচ্ছে না। স্কুলের সব বই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে।"

মধ্যযুগের ইতিহাস, বিশেষতঃ রাজস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তনুজা কোঠিয়াল এসব শুনে বলেন "আকবর রাণাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তাকে বদলে ফেলার উদ্যোগ শুধু ইতিহাসের অবমাননা নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অবমাননা।" শ্রীমতী কোঠিয়াল বলেন "রাজস্থানের মানুষের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে রাণাপ্রতাপ একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র,। তাই রাজপুত আবেগকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে হিন্দুত্বের ভাবাবেগও।"

হিন্দুত্ববাদীরা আকবর ও রাণার লড়াইকে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই প্রয়োজন যুদ্ধে রাণাপ্রতাপকে জয়ী দেখানোর।

কিন্তু ইতিহাসবিদরা বলছেন এই যুদ্ধে মুসলমান সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন হিন্দু রাজপুত মান সিংহ। অন্যদিকে হিন্দু রাজপুত রাজা রাণাপ্রতাপের সেনাপতি ছিলেন মুসলমান আফগান সেনাপতি হাকিম খান সুরি। যুদ্ধ হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের হয় নি। যুদ্ধে দুইপক্ষের সেনা ও সেনাপতিদের অনেকে ছিলেন হিন্দু, অনেকে মুসলমান।

ইতিহাস বা বিজ্ঞানে যাই বলা থাক তাতে কিছু এসে যায় না মৌলবাদীদের। তারা যাকে ইতিহাস, যাকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চায় তাকেই মানতে হবে জনতাকে! গোয়েবলসীয় কায়দায় ভারতের হিন্দুত্ববাদী, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম মৌলবাদী বা ইউরোপ-আমেরিকার নয়া নাৎসীবাদীরা মানুষকে এভাবেই শেখাতে চায়। চরম সংকটগ্রস্থ দুনিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে শ্রমজীবী জনতার মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে কোন মিথ্যাকেই বারে বারে প্রচারে সত্যে পরিণত করার প্রয়াস জারি আছে। প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের এ বিষয় সদা জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। ■

'নোয়া-র নবতরণী'

... তারপর প্রভু যীশু নোহ্-কে বলিলেন, "পৃথিবী পাপ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় আগত। পৃথিবী প্লাবিত হইবে এবং মনুষ্যসহ সকল প্রাণীকূল সেই মহাপ্লাবনে ধ্বংস হইবে। তুমি আমার নির্দেশ মতো একটি সুবিশাল নৌকা বানাইয়া তোমার পরিবারের সকল সদস্যদিগে ও পৃথিবীর প্রত্যেক পাখির দুইটি করিয়া লইয়া উঠিয়া পড়।" ঈশ্বরের নির্দেশ মতো নোয়া একটি বিশাল নৌকা বানাল। তারপর শুরু হল চল্লিশ দিন ব্যাপী মহাবর্ষণ যা পৃথিবীকে প্লাবিত করল। পৃথিবীর সকল পশু পাখি, উদ্ভিদ ধ্বংস হল। ১৫০ দিন পর পৃথিবীর জলতল স্বাভাবিক হলে পৃথিবী আবার সবুজে ভরে গেল। নোয়া ও তার পরিবারের সদস্যগণ ও নৌকায় আশ্রিত সমস্ত জীবজন্তু পৃথিবীতে সৃষ্টির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। নোয়া একটি গীর্জা স্থাপন করে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লাগল। নোয়া ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল মহাপ্রলয় আবার ঘটবে কিনা। ঈশ্বর আকাশে একটি রামধনু এঁকে দিয়ে জানাল মহাপ্রলয়ের আর কোন প্রয়োজন নেই...। বাইবেলের এই কাহিনী সকলেরই জানা। ঐ কাহিনীতে মহাপ্রলয়ের কোন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ না থাকলেও 'নোয়ার নৌকাটি' কিন্তু পুনরায় বানানো হয়ে গেছে মার্কিন মুলুকের কেন্টাকী-তে। বাইবেলে উল্লিখিত মাপ অনুযায়ী ৪৫০ ফুট লম্বা, ৭৫ ফুট উচ্চ ও ৪৫ ফুট চওড়া একটি কাঠের নৌকা। নোয়ার আদিম নৌকাটি বানাতে কত খরচ হয়েছিল তা বাইবেলে উল্লেখ নেই তবে আধুনিক নৌকাটি বানাতে খরচ হয়েছে ১৫ কোটি মার্কিন ডলার। আসলে এটা কোন নিছক নৌকা নয় – বাইবেল পার্ক। কি রাখা হয়েছে এই পার্কে? নৌকাটির মধ্যে রাখা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন পশুপাখির পূর্ণাঙ্গ মডেল। অনেক লাইভ শো, প্রচুর বিনোদনের ব্যবস্থা, রেস্তোরা আরও কত কি! এক কথায় একটি জমজমাট বিনোদন পার্ক। কিন্তু এই পার্কের মালিক Ark Encounter, LLC নামক একটি সংস্থা-র কর্মকর্তারা একে বিনোদন পার্ক বলতে নারাজ। পার্কটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হল Answers in Genesis নামক একটি খ্রিস্টান মৌলবাদী সংগঠন। তাদের বক্তব্য, "বাইবেল কেবলমাত্র কোন ধর্মপুস্তক নয়, বরং এটা একটি ইতিহাস। তাই পার্কটি একটি লোকশিক্ষার অঙ্গ।" অন্যদিকে মার্কিন মুলুকের বহু যুক্তিবাদী সংগঠন ও ব্যক্তি এই পার্ক নির্মাণের সময় থেকেই বিরোধিতা করতে থাকেন। তাদের বক্তব্য, "এটা কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক প্রচার। জনগণের করের টাকায় এমন একটি ধর্মীয় পার্ক নির্মাণ সরকারের বন্ধ করা উচিত। এটা সমগ্র জাতির কাছে লজ্জাজনক। প্রচার করা হচ্ছে মাত্র কয়েক হাজার পূর্বে ঈশ্বর এই পৃথিবী বানিয়ে ছিল, পৃথিবীতে মানুষ ও ডাইনোসর একই সময়ে বসবাস করত। কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা বলে।" বহু বিজ্ঞানী বলেন বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তন তত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে তাই এটা বন্ধ করা উচিত। অবেশেষে আদালতে নিস্পত্তি হয়। আদালত পার্ক নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের আনুগত্যকে সরাসরি উর্দ্ধে তুলে ধরে। পার্কের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে পার্কটির মোট নয়শত কর্মচারীকে হতে হবে মনে প্রাণে খ্রীষ্টান। সমকামীদের কোন পদেই নিয়োগ করা হবে না, এমনকি অবিবাহিত আবেদনকারীদের কৌমার্য্য অক্ষুন্ন রয়েছে এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে।

যাই হোক কেন্টাকী-র বাইবেল পার্ক চালু হয়েছে। পার্কের মালিক খুশি, খ্রিষ্টান ধর্মবাদীরাও খুশি। এমন ধর্মীয় পার্ক যেমন, বাইবেলপার্ক, রামায়ণপার্ক, বুদ্ধপার্ক ইত্যাদি বহু স্থানেই গড়ে উঠেছে ও উঠছে। যেমন ভারতে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে ও অন্ধ্রে ভদ্রাচলমে রয়েছে রামায়ণ পার্ক, বেঙ্গালুরুতে রয়েছে বুদ্ধ-পার্ক ইত্যাদি। এছাড়াও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিহার ও উত্তরপ্রদেশে 'রামায়ণ সার্কিট', 'কৃষ্ণ সার্কিট' এবং 'বৌদ্ধ সার্কিট' গড়ার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্ত পার্কেরই পরিচালকমন্ডলী এগুলিকে বিনোদনপার্ক বলে না। সরাসরি স্বীকার না করলেও এগুলি আসলে ধর্মপ্রচার কেন্দ্র। ধর্মবাদীরা ধর্মের প্রচার ও মানুষের মনে ধর্মীয় ধ্যান ধারণা টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করে। মালিক গোষ্ঠী একদিকে মুনাফার উদ্দেশ্যে ও অন্যদিকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভবিক্ষোভকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যেই ধর্মবাদীদের কাজে লাগায়।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ জানেন, বর্তমান সমাজে মানুষের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। পুঁজিবাদ ও ধর্মবাদ একে অপরকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছে ও মানুষের চেতনায় বৈজ্ঞানিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ধর্মবাদের মোকাবিলা কেবল মাত্র ধর্মবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে করা যাবে না বরং ধর্মবাদের বর্তমান আধার পুঁজিবাদকে ধ্বংস করেই তা করতে হবে। ■

জানা-অজানা ঃ

গ্রহদের আকাশ

পৃথিবীর আকাশের রঙ আকাশী নীল এটা আমরা জানি। আর পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুমন্ডল থাকার জন্য তার রঙ আমরা কেন এমন দেখি তাও জানি। আচ্ছা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল না থাকলে আকাশ কেমন হত?

পৃথিবীতে আসা সূর্যের আলো আসলে প্রধান সাতটি রঙে গঠিত – বেনীআসহকলা, মানে VIBGYOR। এই আলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এসে বায়ুর কণার সাথে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে নীল রঙ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে পৃথিবীর আকাশ মানুষের চোখে**আকাশী নীল** দেখায়। কিন্তু বায়ুমন্ডল না থাকলে আকাশ হত কালো। একদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এর আলো পুরো আকাশ দখলে রাখত না। দিনেও তারা দেখা যেত।

তাহলে কি চাঁদের আকাশ দেখতে কালো? ওখানে তো বায়ুমন্ডল নেই। অন্য গ্রহ বা তাদের উপগ্রহগুলির আকাশ তবে দেখতে কেমন? চাঁদ বা অন্য গ্রহদের রাতের আকাশ কি পৃথিবীর মত এত সুন্দর? অন্য গ্রহকে যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় তেমনি পৃথিবীকে কি সেইসব গ্রহ থেকে দেখা যায়?

এসব প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে প্রথমে সংক্ষেপে পৃথিবীর আকাশ সম্পর্কে একটু জানা যাক।

পৃথিবীর আকাশ

পৃথিবীর রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু হল আমাদের চাঁদ। এর পরের অবস্থানে কিন্তু লুব্ধক নয়। লুব্ধক সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু উজ্জ্বলতায় গ্রহদের চেয়ে পিছিয়ে। খালি চোখে সৌরজগতের মোট ৫টি গ্রহ আমরা দেখতে পাই। এরা হল বুধ, শুক্র (শুকতারা), মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। শনি ছাড়া বাকি সবাই লুব্ধকের চেয়ে উজ্জ্বল। তবে সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় বৃহস্পতি ও শনিকে। বুধ ও শুক্রকে পৃথিবীর সবপ্রান্ত থেকে সব ঋতুতে দেখা যায় না, দেখতে পেলেও কয়েক ঘন্টার বেশি নয়।

এবার তা হলে পৃথিবীর বাইরে একটু ঢুঁ মারি! পৃথিবীর বাইরে একমাত্র চাঁদের আকাশকে মানুষ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে ছবি তুলতে পেরেছে। অন্য কোথাও এখনও মানুষের পা পড়েনি বলে আকাশ কেমন দেখতে তা জানতে পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন মহাকাশযানের পাঠানো তথ্য। যেমন মঙ্গল গ্রহ। শুক্র এবং শনির উপগ্রহ টাইটানের আকাশের তথ্যও এভাবে পাওয়া গেছে।

আকাশ দেখতে কেমন হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বায়ুমন্ডল আছে কি নেই, থাকলে তার উপাদান কী, মেঘ আছে কি নেই ইত্যাদি। এসবের উপর আকাশের রঙ নির্ভর করে। যে আকাশগুলো সরাসরি দেখা যায় নি পরোক্ষ তথ্যের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কেও ধারনা পাওয়া যায়।

বুধগ্রহের আকাশ

বুধ গ্রহের কোন বায়ুমন্ডল নেই। তাই সূর্যের আলোকে বিক্ষিপ্ত করার মত কেউ নেই। দিনের বেলাও তাই **কালো** আকাশ চোখে পড়বে, সাথে থাকবে কিছু বিন্দু বিন্দু তারার আলো। তবে সূর্যের উপস্থিতির জন্য একটি বিন্দু হবে সবচেয়ে বড়। বুধের আকাশে সূর্যের মাপ, পৃথিবী থেকে সূর্যকে যতবড় দেখি তার প্রায় **আড়াইগুণ** এবং **উজ্জ্বলতায় ৬ গুণ** পর্যন্ত। পৃথিবীর রাতের আকাশের মত বুধের রাতের আকাশকে কোন চাঁদ জ্যোৎস্না প্লাবিত করে না। কারণ বুধের কোন উপগ্রহ নেই। বুধের রাতের আকাশে উজ্জ্বলতম বস্তু হল শুক্র গ্রহ (শুকতারা)। পৃথিবী থেকে বুধের আকাশে শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। বুধ গ্রহের আপাত উজ্জ্বলতা (-৭.৭ বা মাইনাস ৭.৭), যেখানে পৃথিবীতে এর মান (-৪.৬)। আমরা জানি আপাত উজ্জ্বলতার মান যত কম হয় বস্তু তত উজ্জ্বল হয়। যেমন চাঁদের আপাত উজ্জ্বলতা (-১২.৭) এবং সূর্যের (-২৭)। বুধ থেকে আমাদের পৃথিবী এবং চাঁদও ভালমত চোখে পড়ে। আপাত উজ্জ্বলতার মান যথাক্রমে (-৫) এবং (-১.২)। পৃথিবীর মত বুধ থেকেও বাকি গ্রহদের দেখা যায় তবে অনেকটা অনুজ্জ্বলভাবে। পৃথিবীর উত্তরমেরু বরাবর যেমন ধ্রুবতারার অবস্থান তেমনি বুধ গ্রহের দক্ষিণ মেরুতে একটি ধ্রুবতারা আছে। এর নাম আলফা পিকটোরিস। কখনও কখনও বুধগ্রহে একই দিনে দুইবার সূর্যোদয় দেখা যায়।

শুক্রগ্রহের আকাশ

যদিও পৃথিবীর আকাশে শুক্রগ্রহ বা শুকতারা খুবই জনপ্রিয় বস্তু কিন্তু শুক্রের আকাশ খুবই নিস্প্রভ। দিনের বেলাও সূর্য দেখা যায় না। রাতেও তারা মিটিমিটি করে না। এর কারণ গ্রহটির বায়ুমন্ডলে আছে অস্বচ্ছ সালফিউরিক অ্যাসিড। সোভিয়েত মহাকাশযান ভেরেনার মতে শুক্রগ্রহের আকাশ **কমলা রঙের**। এই গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করে বলে

এখানে সূর্য ওঠে পশ্চিমে আর অস্ত যায় পূবে। শুক্র হল সেই অদ্ভুদ গ্রহ যেখানে **বছরের চেয়ে দিন বড়**। শুক্র গ্রহের বায়ুমন্ডল পেরিয়ে উপরে উঠলে পৃথিবীর চাঁদ, পৃথিবী এবং বুধগ্রহকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়।

চাঁদের আকাশ

চাঁদেরও কোন বায়ুমন্ডল নেই। তাই এর আকাশ দেখতে **কালো**। তবে দিনের বেলায় সূর্য খুব উজ্জ্বল থাকার কারণে তারাদের দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে সূর্যের আলোর দিক কোনভাবে ঢেকে রাখতে পারলে তারা দেখা সম্ভব। এর কারণ সহজেই বোঝা যায় তাই না! আমরা জানি আলোর উৎসের আশেপাশের বস্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে আলোর দিকে হাত দিয়ে আড়াল করে রাখলে আলোর উৎসের পাশের বস্তু সহজেই দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সূর্যের আলোর দিককে ঢেকে রাখলেও তারা দেখা যাবে না। কারণ বায়ুমন্ডলের কারসাজিতে আলো সব দিকে ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে সূর্যকে দেখতে যেমন লাগে, চাঁদ থেকেও তেমনই লাগে। তবে কিছুটা বেশি উজ্জ্বল এবং সাদারঙের, যেহেতু বায়ুমন্ডল অনুপস্থিত।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগে? খুশির খবর হচ্ছে চাঁদের আকাশের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু কিন্তু পৃথিবীই। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় লাগে, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তার চারগুণ বড় মনে হয়। কারণ দুজনেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। তবে **পৃথিবীতে যখন চাঁদের পূর্ণিমা, চাঁদে তখন পৃথিবীর অমাবস্যা। একইভাবে চাঁদের অমাবস্যার সময় পৃথিবী চাঁদকে দেয় জ্যোৎস্না শোভিত রাত**। তার মানে জ্যোৎস্না চাঁদের একক সম্পত্তি নয়!

আমরা জানি, চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরতে যে সময় নেয় তাতে পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসে। ফলে আমরা পৃথিবী থেকে সবসময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠই দেখতে পাই। সর্বোচ্চ অবশ্য ৫৮% পর্যন্ত দেখা যায়। এর অনিবার্য কারণ হিসেবে চাঁদেরও শুধু একটি পৃষ্ঠ থেকেই পৃথিবীকে দেখা যায়। অন্য পাশ থেকে দেখা যায় না।

পৃথিবীতে বসে আমরা চন্দ্র গ্রহণ দেখি, যখন সূর্যের আলোতে তৈরি পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর গিয়ে পড়ে। এইসময় পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে। এইসময় চাঁদে ঠিক কী ঘটে? একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এই সময় চাঁদ থেকে কেউ পৃথিবীর কারণে সূর্যকে দেখতে পাবে না। তার মানে **চাঁদে তখন হবে সূর্যগ্রহণ**। চাঁদ থেকে পৃথিবীকে অনেক বড় দেখায় বলে চাঁদে সূর্যগ্রহণের সময়ের দৈর্ঘ্যও হবে লম্বা। পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন চাঁদে তা কেমন দেখাবে? এটা তেমন দারুন কিছু হবে না। কারণ পৃথিবীতে সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। ফলে এসময় চাঁদ সূর্যের আলোকে বাধা দিয়ে পৃথিবীর উপর ছায়া ফেলতে চেষ্টা করবে। একারণে পৃথিবীর গ্রহণ হবে ঠিকই তবে চাঁদের আকাশ থেকে দেখলে পৃথিবী যেহেতু চারগুণ বড় তাই চাঁদের আকাশের পৃথিবী খুব একটা ঢাকা পড়বে না। একটি গলফ বল ১৫ ফুট দূরে থেকে সূর্যের আলোর যেমন ছায়া ফেলবে তেমন প্রতিক্রিয়াই শুধু চাঁদ তৈরি করতে পারবে। তবুও এককথায় বলা চলে, **যখনি পৃথিবীতে কোন ধরণের গ্রহণ (Eclipse) ঘটে তখন চাঁদেও একটি গ্রহণ হয়ে থাকে।**

মঙ্গল গ্রহের আকাশ

মঙ্গলগ্রহের একটি পাতলা বায়ুমন্ডল আছে, তবে তা প্রচুর ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। এতে করে আলো অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় আকাশ খুব উজ্জ্বল থাকে। কোন তারা দেখা যায় না। মঙ্গলের আকাশের সঠিক রঙ এখনও জানা যায় নাই। তবে আগে যতটা মনে করা হত, মঙ্গলের আকাশ **ততটা গোলাপী নয়, বরং কমলা থেকে লালের কাছাকাছি**। মঙ্গলের আকাশে সূর্যকে পৃথিবীর আকাশের তুলনায় ছোট দেখায়। এটাই তো হওয়া উচিৎ, তাই নয়? কারণ মঙ্গল তো সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে তার চেয়েও বেশি দূরে। মঙ্গলের দুটো চাঁদ বা উপগ্রহ আছে – **ফোবোস** ও **ডিমোস**। ফোবসকে সূর্যের অর্ধেকের চেয়ে ছোট দেখায়। আর ডিমোসকে লাগে প্রায় বিন্দুর মত। সত্যি করে সূর্যগ্রহণ যাকে বলে তা এই মঙ্গলের চাঁদেরা আকাশে তৈরি করতে পারে না। বরং সূর্য ও মঙ্গল একসাথে একই রেখায় এবং একই তলে এলে এদেরকে সূর্যের উপর দিয়ে চলে যেতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে গ্রহণ না বলে বলা হয় **ট্রানজিট বা অতিক্রমণ** (Transit)। মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে দেখতে ভাবল স্টারের মত লাগে। এর কারণ পৃথিবীর সাথে চাঁদের উপস্থিতি। পৃথিবী ও চাঁদের সর্বোচ্চ আপাত উজ্জ্বলতা হয় যথাক্রমে (-২.৫) এবং (+০.৯)। মনে আছে তো, আপাত উজ্জ্বলতার মান কম হলে বস্তু হয় অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল। তবে শুক্র গ্রহকে আর একটু উজ্জ্বল দেখায়। এর আপাত উজ্জ্বলতা হয় (-৩.২) পর্যন্ত। তবে ফোবোস ও ডিমোস থেকে মঙ্গলকে (পৃথিবী থেকে যেমন) যথাক্রমে তার **৬৪০০** এবং **১০০০ গুণ বড়** দেখায়।

মঙ্গলের পর সৌরজগতে আছে গ্রহাণুপুঞ্জ। আপাতত এদের নিয়ে বলার মত বিশেষ কিছু নেই। তাই আমরা চলে যাচ্ছি বৃহস্পতি গ্রহে। তবে এতক্ষণ যাদের কথা বলা হল – চাঁদ,

মঙ্গল, বুধ, শুক্র; এদের উপর আমরা অবতরণ করতে পারব (যদিও শুক্রের ভয়াবহ বায়ুমন্ডলীয় চাপে মারা পড়ব)। কিন্তু বাকি গ্রহরা হল গ্যাস দানব (Gas giant) অথবা তুষার দানব (Ice giant)। সাধারণত এদের কোন কঠিন পৃষ্ঠ আছে বলে জানা নেই যার উপর আমরা অবতরণের চিন্তা করতে পারি।

বৃহস্পতি গ্রহের আকাশ

বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলের ভেতর থেকে এখনও কোন ছবি তোলা যায় নি। তবে মনে করা হয় **এর আকাশ পৃথিবীর আকাশের মত নীল, তবে অনুজ্জ্বল।** এতে সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা ২৭ গুণ কম। আমরা এখন জেনে গেছি যে শনি ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রহের বলয় আছে। অবশ্য তা খুবই সরু। বৃহস্পতির এই বলয় এর বিষুব অঞ্চল থেকে দেখা সম্ভব। বায়ুমন্ডলের আরও নিচের দিকের এলাকা বিভিন্ন মেঘ ও কুয়াশায় পরিপূর্ণ। ফলে এদিকে সূর্যের আলো আসতে বাধা পায়। পৃথিবীর তুলনায় এখানে সূর্যকে চারভাগের একভাগের চেয়েও ছোট দেখায়।

সূর্যের পরে বৃহস্পতির আকাশে উজ্জ্বল বস্তুরা হল এর প্রধান চারটি চাঁদ (উপগ্রহ)। এরা হল **আয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমিড** এবং **ক্যালিস্টো।** বিজ্ঞানী **গ্যালিলিও** আবিষ্কার করেছিলেন বলে এদের নাম **গ্যালিলিয় চাঁদ**। এদের মধ্যে আয়ো আমাদের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। তবে কিছুটা কম উজ্জ্বল। কিন্তু মাতৃগ্রহ থেকে দেখা এর চাঁদদের মধ্যে আয়োকেই সবচেয়ে বড় দেখায়। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হল গ্যানিমিড। এটি আয়োর কাছাকাছি মানের উজ্জ্বল। তবে দেখতে আয়োর চেয়ে ছোট লাগে, প্রায় অর্ধেক। তবে ইউরোপার চেয়ে অবশ্য দ্বিগুণ দেখায়। ক্যালিস্টো এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরে। ফলে এটিকে দেখতে আয়োর চারভাগের একভাগের মত। আমাদের চাঁদের মত এই চাঁদগুলির পৃষ্ঠ এবড়ো খেবড়ো লাগে না। এরা আমাদের চাঁদের মতই**সূর্যগ্রহণ** ঘটাতে সক্ষম। বরং আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা এই কাজটি বেশিই করে। এর কারণ হল বৃহস্পতির কক্ষীয় নতি পৃথিবীর চেয়ে অনেক অল্প। **অ্যামালথিয়া** ছাড়া এর ভেতরের দিকের বাকি উপগ্রহদেরকে দেখতে তারার মত দেখায়। অ্যামালথিয়া মাঝে মাঝে বড় হয়ে প্রায় ক্যালিস্টোর সমান হয়ে যায়। তবে বৃহস্পতিহর আকাশে এরা সবাই যে কোন তারার চেয়েও কম উজ্জ্বল থাকে। আরও দূরের উপগ্রহদের মধ্যে **হিমালিয়া** ছাড়া কাউকে দেখা যায় না।

এবার আসি বৃহস্পতির উপগ্রহদের আকাশে। এদের সংখ্যা যতটা জানা গেছে **৬৭**। কারোই বলার মত বায়ুমন্ডল নেই। ফলে **আকাশ কালো।** এদের আকাশে বৃহস্পতিকে অসাধারণ দেখায়। অভ্যন্তরীণ উপগ্রহদের মধ্যে এর সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ আয়োতে বৃহস্পতিকে, আমরা চাঁদকে যেমন দেখি তার **৩৮ গুণ বড় দেখায়**। সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ **মেটিস**। এখানে বৃহস্পতিকে দেখায় আমাদের চাঁদের **১৩০ গুণ**। মেটিসে বৃহস্পতি সূর্যের আলোর ৪% পর্যন্ত উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, **আমাদের চাঁদ পৃথিবীর আকাশে সূর্যের চেয়ে ৪০০ গুণ অনুজ্জ্বল।**

শনি গ্রহের আকাশ

আগেই বলা হয়েছে শনি গ্রহেরও কোন কঠিন পাথুরে পৃষ্ঠ আছে বলে জানা নেই। এর বায়ুমন্ডলের **উপরের দিক থেকে আকাশ সম্ভবত নীল দেখায় আর নিচের দিকে আকাশের রঙ হলুদাভ।** শুধুমাত্র অনুসূর (সূর্যের নিকটতম) অবস্থানে থাকার সময় এর উত্তর গোলার্ধে সূর্যকে দেখার সুযোগ আছে। এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে বায়ুমন্ডলের উপরিভাগ থেকে এর বলয় ভালই দেখা যায়।

শনির উপগ্রহরা রাতের আকাশকে খুব বেশি সুন্দর করতে পারে না, যদিও এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত এর **৬২টি উপগ্রহ** শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হল **টাইটান**। এটি শনির আকাশে আমাদের চাঁদের অর্ধেকের মত লাগে। এর আপাতত উজ্জ্বলতা (-৭)। তবে দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে টাইটান শনির সবচেয়ে অনুজ্জ্বল চাঁদ। এর থেকেও উজ্জ্বল দেখায় **মাইমাস, এনচেলাডাস, টেথিস, ডায়োনেওরিয়া**। বাইরের দিকের উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র **ফোবে** কে দেখা যায়। আমাদের চাঁদের মতই শনির ভেতরের দিকের চাঁদেরাও শনিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয় ততক্ষণে শনি নিজের অক্ষের উপর আবর্তন শেষ করে ফেলে। ফলে এদের এক পৃষ্ঠ থেকেই শুধু শনিকে দেখা সম্ভব। তবে এর ভেতরের দিকের চাঁদগুলোতে শনি একটা দেখার মত জিনিস বটে! শনির উপগ্রহ **প্যানের** আকাশে শনিকে আমাদের চাঁদের চেয়ে **১০৪ গুণ বড়** দেখায়। তবে শনির উপগ্রহগুলো থেকে এর বলয় খুব ভালোভাবে দেখা যায় না। এর কারণ এরা শনির বলয়ের সাথে একই সমতলে অবস্থান করছে। অন্যদিকে বলয়ের পুরুত্বও কিন্তু খুব বেশি না।

সৌরজগতের উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র শনির উপগ্রহ **টাইটানের পুরু বায়ুমন্ডল আছে। এর পৃষ্ঠ থেকে আকাশকে দেখতে বাদামী বা গাঢ় কমলা** রঙের দেখায়। টাইটান সূর্যের আলো পায় পৃথিবীর ৩০০ ভাগের ১ ভাগ। ফলে দিনের বেলায় এর আকাশ দেখায় পৃথিবীর গোধূলির মত। পৃথিবী ছাড়া সমগ্র

মহাবিশ্বে এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে **শুধু টাইটানের আকাশে রঙধনু** তৈরি হতে পারে। এখানকার আকাশ থেকে শনিকে দেখা যায় শুধু বায়ুমন্ডলের উপরিভাগের দিকেই।

অন্যদিকে **এনসেলাডাস** উপগ্রহ থেকে শনিকে অনেক ভাল দেখা যায়। আমাদের চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি তার তুলনায় এখান থেকে শনিকে ৬০ গুণ বড় দেখায়। তবে আমাদের চাঁদের মতই এর মাত্র একপৃষ্ঠ থেকেই শনিকে দেখা সম্ভব। এর আকাশে শনিকে বড়-ছোট হতে দেখা যায়। এখান থেকে শনির আরও কিছু উপগ্রহকে দেখা যায়। এদের মধ্যে মাইসাস কে দেখা যায় আমাদের চাঁদের সমান। শনির দক্ষিণ মেরু বরাবর আকাশে আমাদের ধ্রুবতারার মত একটি তারা আছে। এর নাম **ডেল্টা অক্টানটিস।**

ইউরেনাস গ্রহের আকাশ

এই গ্রহের আকাশ খুব সম্ভব **হালকা নীল**। এর হালকা বলয় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দেখা যাওয়ার কথা নয়। ইউরেনাসের দক্ষিণ ও উত্তর দুই মেরুতেই একটি করে মেরু তারা (Pole Star) বা ধ্রুব তারা আছে। এরা হল যথাক্রমে **১৫** ওরাইওনিস ও সাবিক। দুটোই আমাদের উত্তরমেরুর ধ্রুবতারার চেয়ে অনুজ্জ্বল। এর পৃষ্ঠ থেকে কোন উপগ্রহকেই আমাদের চাঁদের মত বড় দেখা যায় না। যদিও এখনও পর্যন্ত **২৭টি** আবিষ্কৃত। তবে সংখ্যায় এরা বেশি হওয়ায় দারুন একটি দৃশ্য তৈরি হয়।

নেপচুন গ্রহের আকাশ

এর আকাশ অনেকটা ইউরেনাসের মত, তবে হালকার বদলে **উজ্জ্বল নীল**। এরও বলয় আছে তবে তা খুবই সরু হওয়াতে গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে দেখা যায় না। সূর্যের পরে এর আকাশে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হল উপগ্রহ**ট্রাইটন**। একে আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট দেখায়। এর আরেকটি চাঁদ **প্রোটিয়াস** দেখতে আমাদের চাঁদের অর্ধেক। নেপচুনের সবচেয়ে বড় চাঁদ হল ট্রাইটন। এর হালকা বায়ুমন্ডল আছে। তবুও **আকাশ কালোই দেখায়**। এর আকাশে নেপচুনকে এক জায়গায় স্থির দেখায়। কেন বলুন তো? এতক্ষণের আলোচনায় তা বুঝে ফেলার কথা।

প্লুটোর আকাশ

বিজ্ঞানীদের মতে প্লুটো আর গ্রহ নয়, বামনগ্রহ (Dwarf planet)। প্লুটো সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় **১৩০** গুণ দূরে। তবু এখানে সূর্য মোটামুটি ভালই উজ্জ্বল। এখানে আমাদের চাঁদের চেয়ে সূর্যের উজ্জ্বলতা **১৫০** থেকে **৪৫০** গুণ। এর বায়ুমন্ডলে আছে নাইট্রোজেন, মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। প্লুটো তার বৃহত্তম উপগ্রহ **শ্যারন**-এর সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আটক। এর কারণে এরা সবসময় একে অপরের দিকে মুখ করে থাকে।

সৌরজগতের বাইরের আকাশ

বর্হিগ্রহ মানে সৌরজগতের বাইরের গ্রহ। ৬৫ থেকে ৮০ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত সূর্যকে খালি চোখে দেখা যাবে। মাত্র ২৭ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত একটি নক্ষত্রের নাম **বিটা কোমিবেরানেসিজ**। আমাদের আকাশে এটি খুব অনুজ্জ্বল। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র জগৎ **আলফা সেন্টোরি** (প্রক্সিমা সেন্টারি নক্ষত্র ও একই বাইনারি জগতের অংশ)। এই অঞ্চল থেকে সূর্যকে দেখা যাবে ক্যাসিওপিয়া তারামন্ডলীতে। উজ্জ্বলতায় আমাদের আকাশের ষষ্ঠ উজ্জ্বল নক্ষত্র **ক্যাপেলার** মত।■

প্রাণীজগতে রঙের বাহার

যদি আপনার পছন্দের লাল গোলাপ হঠাৎ কালো হয়ে যায়, যদি গাছের সবুজ পাতা হয়ে যায় সাদা, শুভ্রতার সাদা রঙ যদি হয়ে যায় লাল, তাহলে কেমন লাগবে একটু ভাবুন তো? কি হবে ভালোবাসার লাল গোলাপের! কি-ই বা হবে শুভ্রতার! লাল গোলাপ হারাবে তার সকল আবেদন, গাছের পাতার বিমুগ্ধতা খুঁজতে গিয়ে বিফল হবে মানুষ। একটু বর্ণ বা রঙের পরিবর্তনের জন্য হয়ে যেতে পারে অনেক কিছু। সঠিক বস্তুর সঠিক রঙ হওয়া তাই বাঞ্চনীয়। আর এই রঙ দেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের চোখ এবং মস্তিষ্ক।

আমাদের মস্তিস্কে রঙের অনুভূতি সৃষ্টি হয় কিভাবে? আমরা কি সব রঙ সম্পর্কে জানি?

চোখের ভিতরে থাকা আলোক সংবেদী কোষ (রেটিনায় রড কোষ ও কোন কোষ) দর্শন স্নায়ুর মাধ্যমে আমাদের মস্তিস্কে বার্তা প্রেরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই আলোক সংবেদী কোষগুলো ডাকঘর এবং স্নায়ুগুলো ডাকপিয়নের মত কাজ করে। ডাকপিয়ন যেমন আমাদের কাছে চিঠি নিয়ে আসলে চিঠি পাবার পর আমাদের যেরকম আবেগের বিভিন্ন ধরণের অনুভূতি (হাসি, কান্না ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি আলোক সংবেদী স্নায়ু মস্তিস্কে বার্তা প্রেরণ করলে আমাদের মস্তিস্ক তখন আমাদের মাঝে রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

আমাদের চোখের যে রেটিনা আছে, সেটা লক্ষ লক্ষ আলোক

সংবেদী কোষ দ্বারা আবৃত। এর কিছু কোষ হচ্ছে রড কোষ, আবার কিছু কোষ হচ্ছে কোণ কোষ। এই আলোক সংবেদী স্নায়ুমুখগুলো আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং অপটিক নার্ভের (দর্শন স্নায়ু) মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্টেক্সে পাঠায়। এভাবেই আসলে আমাদের মাঝে রঙের অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

কার মাথায় প্রথম রঙ নিয়ে গবেষণা করার ভাবনাটা আসে? আইজ্যাক নিউটন। মহাকর্ষ আবিষ্কারের সাথেই তাঁর নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়। আলো নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছেন এই নিউটন সাহেবই। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে, রঙ কোন বস্তুর নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য নয়, এটা আলাদা কোনো বস্তুও নয়। এটা কি করে সম্ভব? তাহলে আমরা যে আপেলের রঙ লাল দেখি, তার রঙ কি লাল নয়? আসলে বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের উপর আলো পড়লে যদি বস্তুটি আলোর সবটুকু শোষণ করে কোন একটা নির্দিষ্ট রঙ শোষণ করতে না পেরে সেই রঙটিকে প্রতিফলিত করে দেয়, তাহলে আমরা বস্তুটিকে সেই নির্দিষ্ট রঙের দেখি।

সেই হিসাবে বলা যায়, আপেলের গায়ে লাল রঙ নেই। আপেলের পৃষ্ঠে বা তলে যখন আলো আপতিত হয়, তখন আপেলের পৃষ্ঠটি লাল ব্যতীত অন্যান্য সকল রঙ শোষণ করে নেয়, এবং লাল রঙকে প্রতিফলিত করে। তাই আমরা আপেলকে লাল রঙের দেখি। আমরা আসলে এই প্রতিফলিত আলো দেখেই ভাবি যে আপেলটি লাল রঙের। তাঁর মানে দাঁড়ায়, আমরা আসলে প্রতিনিয়ত ধোঁকা খাচ্ছি।

রঙের ধরন-রঙের বাহার

রঙ মূলত দু'ধরণের– মৌলিক রঙ এবং যৌগিক রঙ।

মৌলিক রঙ বলতে আমরা সবাই বুঝি – লাল, সবুজ, নীল। কেউ কেউ মৌলিক রঙগুলোকে সংক্ষেপে "আ স ল" অর্থাৎ আসমানী (নীল), সবুজ, লাল বলে থাকে। তবে আপনি যদি চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তখন মৌলিক রঙ হিসেবে লাল, হলুদ এবং নীলকেই পাবেন। সেক্ষেত্রে সবুজ একটি যৌগিক রঙ। তবে সাধারণত আমরা যে স্ট্যান্ডার্ডে রঙের বিচার করি, তাতে লাল, নীল, সবুজকে মৌলিক রঙ হিসেবে বলতে পারি। আর এই লাল, নীল, সবুজ রঙকে সমান অনুপাতে মিশিয়ে আমরা সাদা রঙ পেতে পারি। আবার এই তিনটি রঙকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে আমরা আলোক বর্ণালীর সবকটি রঙই পেতে পারি। আর এই তিনটি মৌলিক রঙ থেকে আমরা যেসব রঙ পাব, সেগুলো হচ্ছে যৌগিক রঙ।

আপনি কি জানেন, মোট রঙ কয়টি? ছোটদের রঙের পেন্সিল বক্স খুলে দেখলে হয়তো ৬টি, ১২টি অথবা ২৪টি রঙ দেখতে পাবেন। কিন্তু আসলেই মোট কয়টি রঙ আছে? উদাহরণ হিসেবে বলি, কোন শিশুকে জিজ্ঞেস করলে সে লাল, নীল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি আরও কয়েকটি রঙের নাম বলতে পারবে। আবার আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে হয়তো বেগুণী, গেরুয়া, সোনালি, রূপালি, বাদামী, খয়েরি এই ধরণের আরও কয়েকটি রঙের নাম বলতে পারবেন। কিন্তু **আমাদের চোখই প্রায় ১০ মিলিয়ন রঙকে পৃথকভাবে সনাক্ত করতে পারে**। আমরা কেবল অল্প কিছু রঙের নামকরণ করেছি। এতসব রঙের নাম দেওয়া তো সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক রঙকে পৃথক করার জন্য তাদেরকে সংখ্যা এবং কোডের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া রঙের আরও ভেরিয়েশনের জন্য কয়েকটি কালার মডেল প্রবর্তন করেছেন। কেননা, শুধুমাত্র লাল, সবুজ, নীল রঙ (RGB Colour) দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের বা সীমার রঙ তৈরি করা সম্ভব। আমরা বর্তমানে যেসব প্রযুক্তি (কম্পিউটার, টেলিভিশন, প্রিন্টার, স্মার্টফোন ইত্যাদি) ব্যবহার করি, তার জন্য আরও অনেক বেশি রঙের ভেরিয়েশনের প্রয়োজন হয়। তাই CMY (Cyan, Magenta, Yellow) কালার মডেলের রঙগুলোকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে আরও প্রচুর রঙ তৈরি করতে পারি। বিশেষ করে প্রিন্টার এই কালার মডেল ব্যবহার করে ছবি প্রিন্ট করে।

কোনো বস্তু কী রঙ দেখাবে সেটা বস্তুর একটি বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ তরঙ্গগুলিকে শোষণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আলোক তরঙ্গের মিশ্রণ থেকে কিছু তরঙ্গ কে শোষণ এবং কিছু তরঙ্গকে প্রতিফলিত করার জন্য প্রতিটি বস্তুর একটি বিশেষ ধর্ম আছে। যখন কোন বস্তুর উপর আলো পড়ে তখন সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। বস্তুটি আলোর তরঙ্গ-মিশ্রণের থেকে বেশ কিছু বা প্রায় সব তরঙ্গই শোষণ করে নিতে পারে। কখনও কখনও আবার শোষণ না করে সমস্ত রঙের তরঙ্গগুলিকেই প্রতিফলিত করে দিতে পারে। বস্তু যখন কোনো তরঙ্গকে শোষণ না করে প্রতিফলিত করে তখন ঐ তরঙ্গের আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। আমরা তখন সেই বস্তুটিকে দেখতে পাই এবং বস্তুটিকেও সেই তরঙ্গের বর্ণেরই মনে করি। সব সময় যে আবার মেপে মেপে যে সাতটি বর্ণের মধ্যেই আমাদের দেখা সীমাবদ্ধ থাকবে তাও ঠিক নয়। যেমন কিনা নানা ধরণের সবুজ রঙ। গাঢ় সবুজ, হাল্কা সবুজ, হলদে-সবুজ। আসলে সেই বস্তুগুলি থেকে সবুজ তরঙ্গের সঙ্গে মিলে আছে অন্য কাছাকাছি রঙও। আলোক বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু সাদা এবং কালো বলতে কোন রঙ নেই। সাদা বলতে বোঝায় সকল রঙের সমষ্টি আর কালো হচ্ছে সকল রঙের

অনুপস্থিতি। কখনও কখনও কোন রঙের কাছাকাছি তরঙ্গগুলি মিলেমিশে গেলে দেখতে পাই যৌগিক বর্ণের বস্তু। তাইতো বিজ্ঞান বলে আমাদের চোখ শুধু সাতটি বর্ণ নয়, সাতবর্ণ দ্বারা তৈরি প্রায় ১০ মিলিয়ন বর্ণ সনাক্ত করতে পারে। এত সব বর্ণ হয় কী ভাবে। মূল বর্ণগুলিকে বলা হয় হিউ, তার থেকে যৌগিক ভাবে তৈরি হয় আরাগ বা টিন্ট এবং ছায়া বা সেড। আমাদের চোখ এই সব মিলিয়ে প্রায় এককোটি রঙকে পৃথক ভাবে সনাক্ত করতে পারে।

প্রাণী জগতে রঙের গুরুত্ব

প্রাণী জগতে তো রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে সংকেত আদান প্রদান থেকে শুরু করে পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য নানান জৈবিক প্রক্রিয়ায় রঙ যেন জীয়ন কাঠি। প্রাণীজগতে রঙ চেনার ব্যাপারেও অনেক বৈষম্যতা আছে। যেমন মানবকুল অনেক রঙ দেখতে পারলেও বেশ কিছু প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কিন্তু লালবর্ণ দেখতে পায়না। **অনেক প্রাণী আমাদের মত অনেক রঙ দেখতেই পারেনা যেমন ঠিক তেমনি তারা দেখতে পারে এমন অনেক রঙ যা আমরা দেখতে পাই না।** প্রাণীজগতে এই সব এক বিশাল গুরুত্ব বহন করে চলেছে। মানুষ এবং প্রাণীদের কাছে সনাক্তকরণের জন্য রঙ এর ভূমিকা বিশাল। রঙ বা বর্ণ প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন সংকেতের আদান-প্রদান এবং পরিবেশে অভিযোজনের জন্যও অপরিহার্য। বর্ণ একদিকে কিছু প্রাণীদের পরিবেশে মিলেমিশে শিকার ধরতে যেমন সাহায্য করে তেমনি অন্য দিকে কোন কোন প্রাণীদের শিকারীপ্রাণীদের চোখে ধুলো দিতেও সাহায্য করে। অনেক প্রাণীদের জীবন যেমন নিগোপনতা বা অনুকারিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়াও আবার বর্ণের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীর দেহের বর্ণ যেমন ভয় দেখায় তেমনই পরিবেশের সাথে মিশিয়ে জীবন বাঁচাতেও সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণ চেনার ব্যাপারটা বেশ জটিল কিন্তু মজাদার। যেমন আমাদের চোখ প্রায় ৮০০-৭৫০ থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গের আলো দেখতে পায়। মৌমাছিদের পুঞ্জাক্ষির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ৬৫০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার। অর্থাৎ কোনও বস্তুর উপর আলো পড়ে তার থেকে প্রতিফলিত বর্ণগুলিকে চেনার জন্য একেক প্রাণীর চোখ একেক ভাবে তৈরি। যার চোখ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ধরতে পারে তার কাছে বস্তুটি সেই বর্ণেরই মনে হয়। আমরা হলুদ ফুলকে হলুদ দেখলেও মৌমাছি হলুদকে হলদে-সবুজ দেখে। লাল-হলুদ ফুলকে আমরা দেখি লাল আর হলুদ রঙের। ঠিক তাকেই মৌমাছি দেখে অতিবেগুনী, নীল এবং সবুজ রঙের। তারা আবার লাল-বর্ণ দেখতে পায় না কিন্তু যা আমরা দেখতে পাইনা যেমন অতিবেগুনী বর্ণ সেই বর্ণকে মৌমাছিরা দেখতে পায়। প্রজাপতিরা সেই ফুলকেই দেখে অতিবেগুনী, নীল, সবুজ এবং লাল রঙের। কী অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার! একেক প্রাণীর ক্ষেত্রে তা একেক রকম। তাই আমরা যা কিছু যে রঙের দেখি অন্য প্রাণী তা সে রঙের নাও দেখতে পারে। কালো ময়নাকে আমরা কালো দেখলেও তার সঙ্গী তাকে নীল-সবুজ-লাল-হলুদের বর্ণীল হিসাবেই দেখে। পাখিদের চোখেও চতুর্থ ধরনের কোণ-কোষ থাকে যা দিয়ে তারা ম্রিয়মান অতিবেগুনী রশ্মিকে দেখতে পায়। যা আমরা পারিনা।

সব প্রাণীই যে চোখ দিয়ে বর্ণ চেনে তা আবার ঠিক নয়। সবাই জানি বেচারা সাপদের নাকি দৃষ্টি শক্তি খুব দুর্বল। তা হলে তারা শিকারকে চিনতে পারে কী ভাবে? শুনলে অবাক হবেন যে অনেক সাপের চোখের সামনে তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় থাকে যাকে বলা হয় **লরিয়েল পিট**। যা দিয়ে সে শিকারের অস্তিত্ব টের পায়। বেশ উন্নত ধরনের যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সামনের শিকারের গায়ের তাপমাত্রার অতি সামান্য তারতম্য থেকে সাপ তার মস্তিষ্কে বর্ণের ছাপ বানিয়ে নেয়। যেমন একটি ইঁদুরের দেহের মাঝ অংশে বেশি তাপমাত্রার অংশটিকে সাপ দেখে লাল বর্ণের এবং দেহের বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার অঞ্চলটিকে দেখে নীল বর্ণের। আরেকটু ভেবে দেখুন যে আপনি যদি কোনও পিট ভাইপার সাপের সামনে গিয়ে পড়েন তাহলে আপনি যতই ফর্সা হউন না কেন সাপ কিন্তু আপনাকে দেখবে লাল আর নীল বর্ণের। সে আবার এই সবটাই দেখে চোখ ছাড়া। শুধু ওই তাপ-সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক দিয়ে। এই ক্ষমতাও সে আলোতেই থাকুক আর অন্ধকারে, তার শিকারকে ঠিক দেখে নেয়। তার কাছে দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলেও প্রকৃতির দানে সে তাপ-দৃষ্টিতে পটু!

প্রাণীজগতে রঙের খেলা যেন মায়ার কাজল। রঙের যে কী গুরুত্ব তা ভাবা যায় না। কতো প্রাণীর প্রাণ আর বেঁচে থাকার যোগান নির্ভর করে আছে রঙের খেলার উপর। কেউ বা যা নয় তা সেজে আছে আবার কেউ বা প্রকৃতির বুকে এমন ভাবে লুকিয়ে আছে যাকে সনাক্ত করা মুখের কথা নয়। কারোর হয়তো সঙ্গী বাছাই থেকে খাদ্য ও খাদকের সবকিছুই রঙের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীজগতে **ভ্রান্তিজনক রঞ্জন** বা **ডিসেপটিভ কালারেশন** এক বিরাট ভূমিকা বহন করে চলেছে। দেহে ভ্রান্তি জনক রঞ্জন প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে অথবা শিকার করতে

সাহায্য করে। জীববিদরা এই বর্ণ নির্ভর জৈবিক ক্রিয়াটিকে দুই ভাবে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে **নিগোপন বা ক্যামোফ্লেজ** এবং আরেকটি হচ্ছে **অনুকারিতা বা মিমিক্রি**। এই সবই হচ্ছে রঙ-এর খেলা। বর্ণ পরিবর্তন বা নকল করা সব কিছুতেই যেন প্রাণীদের ছলচাতুরী। সবটাই জগতে টিকে থাকার জন্য। হয় শিকার করা বা বাঁচা। তাই প্রাণী জগতে রঙ বা বর্ণ শুধু সৌন্দর্য-এর জন্য নয়। সবটাই জীবন সংগ্রামের জন্য। রঙীন ফুল, বর্ণীল পাখি বা সুন্দর প্রজাপতি সবাই নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই রঙের বাহার দেখায়।

বর্ণগ্রহ (colouration) ও **অনুকৃতি (mimicry)** বা **নিগোপন (comouflage)** পদ্ধতিটিতে প্রাণীর গায়ের বর্ণ তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যা তাকে চারপাশের সাথে সংমিশ্রিত হতে সাহায্য করে। এর ফলে তার শিকার বা শিকারী তাকে চিনতে পারে না। যদি শিকার হয় তাহলে শিকারী তাকে চিনতে পারবেনা। তাকে খুঁজে বের করতেও শিকারীর অনেক মেহনতের প্রয়োজন হবে। আর যদি শিকারী হয় তাহলে তো তার বেশ মজা। শিকারের সামনে আচমকা হাজির হয়ে সে সহজেই শিকার ধরতে পারবে। একদম সহজ উদাহরণ হচ্ছে মেরু-ভাল্লুক। সাদা বরফের মাঝে সেও সাদা বর্ণের। কার সাধ্য আছে দূর থেকে তাকে চিনতে পারে। এই কৌশল শুধু প্রাণীদের নয় মানুষও কখনো কখনো বেশ কাজে লাগায়। যেমন কিনা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের পোশাক থেকে শুরু করে আধুনিক অস্ত্র সব কিছুই ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে একদম মিশিয়ে রঙ করিয়ে নেওয়া হয়।

সংমিশ্রণী রঞ্জন বা **ব্লেন্ডিঙ্গ কালারেশনের** অনেক উদাহরণ প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন কিনা ডোরা কাটা বাঘ। তারা থাকে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে (বাদাবনে)। সেখানে তাদের গায়ের সোনালী এবং কালচে বাদামী ডোরা এবং জঙ্গলে আলো ছায়ার খেলা তাদেরকে পরিবেশের সাথে মিশিয়ে দেয়। সেখানে তাদের আলাদা করে চিনতে পারা অনেক শিকারের পক্ষেই কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। ঠিক তেমনই আবার জাগুয়ার, চিতা ইত্যাদির গায়ের ছাপ ঠিক যেন যে পরিবেশে তারা থাকে সেখানে খাপ খাওয়ার মতো। নিগোপনতায় পারদর্শী প্রাণীদের তালিকা কিন্তু বেশ বড়ো। কলিমা পতঙ্গ থেকে শুরু করে গিরগিটি সবাই এতে বেশ পটু। গিরগিটি তো তার এই বর্ণচোরা নামেও খ্যাত। কথায় বলে, 'গিরগিটির মতো রঙ বদলানো'।

প্রতিদারী বা **ভ্রান্তিজনক রঞ্জন** বা **ডিসরপটিভ কালারেশন** হচ্ছে প্রাণীদের দেহে ডোরা বা ছোপ যা অন্য প্রাণীদের চোখে ধুলো দিতে সাহায্য করে। যেমন কিনা জেব্রা। তাদের দেহ সাদা কালো ডোরা কাটা থাকে। তাদের প্রধান শিকারী হচ্ছে সিংহ। তারা থাকে ঘাস ভরা জঙ্গলে। অনেকের মনে হতে পারে জেব্রার দেহের ডোরা কাটা দিনের আলোতে আরও ভাল করে বোঝা যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তা হয় না। কারণ, দিনের প্রখর আলোতে সিংহ শিকার করে না। সে তখন বিশ্রাম করে। সিংহ শিকার ধরে পড়ন্ত বিকালে বা ভোরে। তখন জেব্রার দেহের এই ডোরা কাটা দাগ পরিবেশের ঘাসের সাথে মিশে থাকতে সাহায্য করে। তাছাড়া জেব্রারা থাকে দলবদ্ধ ভাবে। সিংহদের লক্ষ্য থাকে সেই দলের সবচেয়ে দুর্বল জেব্রাটিকে পাকড়াও করা। কারণ পরিশ্রম কম হবে। তাই যখন সে জেব্রার দলকে আক্রমণ করে তখন জেব্রার দল চারদিকে ছড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করে। আর তাদের দেহের ডোরার জন্য সিংহ তখন সেই লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে। জেব্রাদের সেই সাদা-কালো ডোরা সিংহের চোখে কেমন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

প্রতি-ছায়াকরণ বা **কাউন্টার সেডিং** নিগোপনতার একটি বিশেষ প্রকার। যার মধ্যে প্রাণীদের দেহের উপরের অংশের বর্ণ এবং নীচের দিকের বর্ণ স্পষ্ট প্রতিছায়ার মতো হয়ে থাকে। যেমন লাল-কাঠবিড়াল এর দেহের উপরের লোমগুলি হয় লালচে বাদামী যার দরুন সে যখন মাটিতে নামে তখন তাকে হঠাৎ করে চেনা যায় না। আবার তার বুকের দিকের লোমগুলো হয় সাদা তাই যখন সে গাছের উপর থাকে তখন নিচে থেকে তাকে চিনতে পারাও কষ্টকর হয়ে উঠে কারণ তখন তার পেছন দিকে থাকে হালকা বর্ণের আকাশ। কী দুষ্টু হয় কাঠবিড়ালী। গাছেরও খায় আবার মাটিরও কুড়োয়। এই ব্যাপারে পেঙ্গুইনরাও কম যায় না। পিঠের দিকে কালো এবং সামনের বুক সাদা। তাই যখন জলে সাঁতার কাটে তখন উপর থেকে শিকারী প্রাণী কালো অংশটির জন্য পেঙ্গুইনদের ঠিক চিনতে পারে না। আর জলের নিচের শিকারী প্রাণী তলা থেকে পেঙ্গুইনদের সাদা বুক দেখে মনে করে ভাসমান সাদা বরফ। পেঙ্গুইনরা রঙের কারিকুরিতে দিব্যি ফাঁকি দেয় শিকারী প্রাণীদের।

কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ অন্য কারোর বা বস্তুর মতো রঙ ধরে। অর্থাৎ একজন আরেকজনকে নকল করে। এই প্রক্রিয়াকে **অনুকৃতি** বলা হয়। এই অনুকৃতির তিনটি ধরনের চরিত্র দেখা যায়। যাকে নকল করা হয় তাকে বলা হয় মডেল। যে নকল করে অন্যের রূপ নেয় তাকে বলা হয় মিমিক। তা দেখে যে ধোঁকা খায় তাদের বলা হয় ডুপ। অনুকৃতি আবার দুই রকম **বেটসিয়ান** এবং **মুলেরিয়ান**। যেমন একটি প্রাণী বিষাক্ত, তাকে

সবাই ভয় পায়। তাকে যদি অন্য আরেকটি বিষহীন প্রাণী নকল করে অন্যদের ভয় দেখায় তখন তাদের **বেটেসিয়ান অনুকৃতি** বলা হয়। বিষাক্ত প্রবাল সাপদের মতো দেখতে হয় কিং সাপ। অন্য প্রাণীরা কিং সাপদের দেখে প্রবাল সাপ মনে করে এড়িয়ে চলে। এতে লাভ হয়ে যায় কিং সাপদের। কিং সাপ বিষধর না হয়েও বেশ ফায়দা লুটে ফেলে।

মূলেরিয়ান অনুকৃতির দুই বা তার বেশি প্রজাতির প্রাণী উভয়েই বা সকলেই আক্রমণকারী প্রাণীর কাছে অখাদ্য বা বিষাক্ত। এই অনুকারিতায় প্রাণীরা বিভিন্ন প্রজাতির হলেও দেহের বর্ণে এবং ধরনে এমন অদ্ভুত মিল থাকে যে এদের দেখতে এক রকমের মনে হয়। জার্মান বিজ্ঞানী মূলের-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ প্রজাতিগুলি একে অপরের নকল করে একে অপরকে বাঁচতে সাহায্য করছে। এই অনুকারিতার ফলে একের অধিক প্রজাতির প্রাণীরা দেখতে একই রকম হওয়ার ফলে পরিবেশে একই ধরনের দেখতে প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তবে প্রশ্ন আসে, এখানে মডেল কে বা অনুকারী জীবই বা কে। কারণ উভয়েই তো কম বেশি বিষাক্ত এবং মিথোজীবীর মতো দুই প্রজাতিই লাভবান। জীববিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে **প্রজাতির প্রাণী সংখ্যায় কম তাদের অনুকারী জীব** বলা হয় এবং **যাদের সংখ্যা বেশি তাদের বলা হয় মডেল**। তার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকার **মোনার্ক** এবং **ভাইসরয় প্রজাপতি**। দুইটি প্রজাতির প্রজাপতিরাই ডানার মধ্যে কমলা এবং কালো বর্ণের ডোরার কারসাজিতে প্রজাপতি খেকো পাখিদের হাত থেকে বেঁচে আছে।

প্রাণীজগতে **প্রচ্ছন্ন রঞ্জন** বা **ক্রিপটিক কালারেশন**-এর সেরা উদাহরণ হচ্ছে **গিরগিটি**। পরিবেশের সাথে মিশে থাকার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার। তাদের কাহিনী বেশ মজাদার। সবাই তো জানি তারা গায়ের বর্ণ পরিবর্তনে ওস্তাদ। তাদের ত্বকে যা সব 'ব্যবস্থা' আছে বা স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষমতা আছে তার ধারে কাছেও আমরা নেই। শুনলে অবাক হবেন গিরগিটিদের ত্বকে ব্যাঙের ত্বকের মতোই **বর্ণবহ** বা **ক্রোমাটোফোর** থাকে। কিন্তু ব্যাঙ বেচারারা বহুরূপী গিরগিটির বা ক্যামিলিয়নদের মতো ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। বহুরূপী গিরগিটিদের ত্বকের ভিতরের স্তরে থাকে **মেলানোফোরস** বা **মেলানিন**। যাদের **বর্ণ কালো এবং বাদামি**। তার ঠিক উপরের স্তরে থাকে **ইরিডোফোরস**, যার মধ্যে **নীল রঞ্জক** ভর্তি থাকে। যা ত্বকে পরা নীল এবং সাদা আলোকে প্রতিফলিত করে। বহুরূপী গিরগিটিদের একদম বাইরের স্তর হয় স্বচ্ছ যার নিচে থাকে **ইরিথ্রফোরস** এবং **জেনথোফোরস**। ত্বকের যে যে কোষগুলি রঞ্জক বহন করে তাদের সংকোচন প্রসারণ বা চালনার ক্ষমতা আবার মস্তিষ্কের হাতে। ত্বকের এই স্তরগুলি এবং কোষগুলিকে নাড়াচাড়া বা সঙ্কুচিত-প্রসারিত করে বহুরূপী গিরগিটিরা বিভিন্ন সময়ে চাহিদা অনুযায়ী দেহের বর্ণ পরিবর্তন করে ফেলে। তা দিয়ে তারা শত্রুর হাত থেকে বাঁচা বা শিকারের কাছে চলে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকা, সব অনায়াসে করে ফেলে। তার সাথে সঙ্গীর কাছেও নিজেকে মোহিনী করে তোলে। এই তো গেল তাদের ত্বকের কথা। তাছাড়া তারা আমাদের থেকে আরেক দিকেও এগিয়ে আছে। সেটা হচ্ছে তারা আমাদের দৃশ্যমান আলোর থেকে কম তরঙ্গের বর্ণ-অতিবেগুনী বর্ণকেও দেখতে পায়।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে বহুরূপী গিরগিটিরা দেহের তাপমাত্রার তারতম্য বজায় রাখার জন্যও দেহের বর্ণ পরিবর্তন করে কারণ তাদের মস্তিষ্ক আমাদের মত দেহের তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই যখন দেহের তাপমাত্রা কমে যায় তখন দেহের রঙ কালচে করে ফেলে যা সূর্যের আলো গ্রহণ করে দেহকে তাপের যোগান দেয়। আবার বেশি হয়ে গেলে দেহের বর্ণ হালকা করে সূর্যের রশ্মি ফিরিয়ে দিয়ে দেহকে ঠান্ডা করে। তাছাড়া অন্য বহুরূপী গিরগিটিকে বিভিন্ন সংকেত দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেহের বর্ণের পরিবর্তন বেশ সাহায্য করে। পুরুষ গিরগিটি দেহের বর্ণ উজ্জ্বল করে তার এলাকায় আধিপত্যের জানান দেয়। আবার অনেক সময় গাড় রঙ ধারণ করে আক্রমণাত্বক হয়ে উঠে। স্ত্রীরাও দেহে বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সঙ্গীকে প্রেম নিবেদন করে থাকে।

সমুদ্রজীবী অক্টোপাসও এই ব্যাপারে বেশ পারদর্শী। তারা খুব দ্রুত চলার সাথে সাথে পটভূমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের বর্ণও পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। তাদের দেহের বহির্ত্বকে রঞ্জক বা বর্ণবহ দ্বারা ভর্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি থাকে। এই থলিতে থাকে লাল, হলুদ এবং বাদামী রঞ্জক। অনেক প্রজাতির অক্টোপাসদের আবার পাঁচ ধরনের রঞ্জকও থাকে। দেহের পেশীর সংকোচন ও প্রসারনের দ্বারা তারা রঞ্জকভর্তি থলির নাড়াচাড়া করে দেহের বর্ণ নিজের ইচ্ছা মতো করে নেয়। কী অদ্ভুত ক্ষমতা! অনেক অক্টোপাস নাকি ভয় পেলে বাঁচার জন্য আশেপাশের জলকে ঘোলা করে দেওয়ার জন্য কালি বা ইঙ্ক ছুড়ে মারে। সেই কালির বর্ণও তারা পটভূমির বর্ণের উপর নির্ভর করেই ছাড়ে। তাদের দেহে এর জন্য **কালিগ্রন্থিও** উপস্থিত। যার কাজ বিপদের সময় মস্তিষ্কের 'কথা' শুনে প্রয়োজনীয় কালি ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দেওয়া।

এইসব ছাড়াও কিছু প্রাণী তাদের দেহের বর্ণকে কাজে লাগিয়ে আরেকটি কায়দা রপ্ত করে নিয়েছে যার কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী **রবার্ট হুক** এবং **আইজ্যাক নিউটন** এবং বিজ্ঞানী **থমাস ইয়ং** পরে যার ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেটা হচ্ছে তাদের দেহের কিছু সূক্ষ্ম গঠন আলোর রশ্মিকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে বা পথ পাল্টে দেয় যার দরুন দেহের ঐ জায়গাটি বেশ রঙ বেরঙের হয়ে যায়। যাকে বলা হয় **গাঠনিক রঞ্জন**। যেমন কিনা **ময়ূরের পালক**। ময়ূরের পালকে বাদামি রঞ্জক থাকলেও পালকের সূক্ষ্ম গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় ভাণু স্ফটিক বা ফোটোনিক ক্রিস্টাল্‌স দেখা যায় যার দ্বারা নীল, সবুজ এবং অন্যান্য বর্ণ প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই ময়ূরের পালকে বাদামি রঞ্জক থাকলেও সেটাকে বেশ রঙ বেরঙের দেখায়। ঠিক এমনই ঘটনা দেখা যায় বিভিন্ন পাখিদের পালকে। সূক্ষ্ম গঠনের জন্য পাখিটি রঙ্গীন হয়ে ওঠে। এই রকম রঙের বাহার সব চেয়ে বেশি দেখা যায় প্রজাপতিদের ডানায়। রঙ্গীন প্রজাপতিদের ডানায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশগুলি বিভিন্ন রঙের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে রঙের বাহার দেখায়। রঞ্জক ছাড়াও তারা দেহের গঠন দিয়ে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করতে পারে। এই সবের জন্য প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া দায়ী। প্রাণী দেহের যেমন পাখীর পালক, প্রজাপতির ডানা বা অনেক সময় প্রাণীদের দেহের সূক্ষ্ম পেশী তন্তু থেকে অনেক আলোক কণার স্ফটিক এবং **ডিফ্রেকসন গ্রেটিংস** বা **আলোকরশ্মির অপবর্তন** দ্বারা এমন বিভিন্ন বর্ণ দেখা যায়।

অভিব্যক্তিগত দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলেও দেখা গেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনও কিন্তু প্রাণীদের বর্ণ এবং তার পটভূমির সাথে তালমিলকে সাহায্য করে থাকে। একই প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণ এর প্রাণীদের মাঝে যাদের দেহের বর্ণ তার প্রকৃতির সাথে মানানসই তাকেই প্রাকৃতিক নির্বাচনও সাহায্য করে। একটু খোলসা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রকারণের প্রাণীদের দেহের বর্ণ তার পরিবেশের সাথে মিশে থাকতে সাহায্য করে এবং তাদের শিকারী প্রাণী থেকে বাঁচার সম্ভাবনা বেশি এবং সেই প্রকারণ-এর প্রাণীরাই যোগ্যতম হিসেবে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে। অভিব্যক্তিবিদরা একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেটা হচ্ছে নিউ মেক্সিকোর চিহুয়াহুয়ান মরুভূমির উত্তরে পাহাড়ে ঘেরা তুলারসা উপত্যকায় জিপসাম ভর্তি সাদা বালি অঞ্চলে কিছু প্রাণীদের বেঁচে থাকার কাহিনী। জিপসাম ভর্তি হওয়ার জন্য বালির বর্ণ হয় বেশ সাদা। এই অঞ্চলে যে সব প্রাণীদের দেখা যায় তারা সকলেই হয় একটু হালকা বর্ণের। কারণটা হচ্ছে পটভূমির সাথে প্রাণীদের দেহবর্ণের মিলের ফলে শত্রুর চোখকে ধোঁকা দেওয়া। ওই এলাকায় তিনটি প্রজাতির গিরগিটি জাতীয় প্রাণী যাদের দেহের বর্ণ সাধারণত ধূসর বা বাদামি বর্ণের হয়। তাদের যে প্রকারণগুলি সাদা বালির দেশে থাকে তাদের গায়ের বর্ণও হালকা হয়, কিছু কিছু আবার সাদাও দেখা যায়। এমনকি পোকা মাকড়দেরও দেখা যায় হাল্কা বর্ণেরই। এমন আরেকটি উদাহরণ দেখা যায় এক প্রকার ইঁদুর, **Perognathus goldmani**। এদের ভর ৩০ গ্রামেরও কম। যাদের বাস এই সাদা বালির মরুভূমিতে। তাদের গায়ে দেখা যায় সাদা লোম সাথে হলুদ আভা। আবার সেই একই প্রজাতির অন্য প্রকারণ-এর ইঁদুরগুলি যারা এই মরুভূমি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের অঞ্চলে বাস করে তাদের গায়ের লোমগুলি হয় ধূসর-বাদামির। যে জায়গাটা আগ্নেয়গিরির জমাকৃত লাভার পাথুরে অঞ্চল, সেখানে সেই একই প্রজাতির প্রাণীগুলির যেমন গিরগিটি জাতীয় প্রাণী এবং ইঁদুর সকলেই কেমন একটু কালচে বর্ণের হয়। ওই জায়গার পটভূমিও হয় কালচে পাথরের। এর দ্বারা বলা যেতে পারে প্রত্যেক পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্যান্য জৈবিক ও প্রাকৃতিক শর্তের সহ পটভূমির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণের প্রকরণকে সাহায্য করে। একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রকরণের বর্ণ তার পটভূমির সাথে খাপ খেয়ে যাওয়াতে অন্য বর্ণের প্রকরণের তুলনায় তারা যোগ্যতম হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবেচিত হয়। দীর্ঘকালীন সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ঐ পটভূমিতে তাদেরই প্রাধান্য বজায় থাকে। এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদে প্রাণীদের দেহের বর্ণের এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়ে গেছে। পরিশেষে বলা যায় প্রকৃতিতে প্রাণীদের বিভিন্ন বর্ণের উৎস তাদের প্রধান তিনটি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে বেশিরভাগ প্রাণীদের দেহে থাকা বিভিন্ন জৈব-রসায়নিক যৌগ বা রঞ্জক। এই রঞ্জক দ্বারা পতিত আলোর শোষণ এবং প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভিন্ন বর্ণের খেলা দেখায় তারা। **দ্বিতীয়** প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দেহের বিভিন্ন বিশেষ গাঠনিক ক্ষমতার ফলে পতিত আলোর দিশা পাল্টে বা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নানান বর্ণের সৃষ্টি করা। **তৃতীয়** পদ্ধতিটি হচ্ছে, দেহ থেকে **জৈব-দীপ্তি** বা **বায়োলুমিনিসেন্ট আলোর বিচ্ছুরণ**। এই আলো আবার বিভিন্ন বর্ণেরও হয়। যেমন কিনা জোনাকি পোকা সবুজ নীলাভ আলো দিয়ে তার সঙ্গীকে সংকেত পাঠায়। আলোকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীরা বিভিন্ন বর্ণ তৈরি করে এবং তার সঙ্গী, দল বা অন্য প্রজাতির প্রাণীদের সংকেত পাঠায়। সেই সাথে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় রসদকে কাজে লাগিয়ে সে পৃথিবীতে যোগ্যতম হিসেবে বেঁচে আছে এবং প্রকৃতিকে করে তুলেছে বর্ণীল এবং মায়াময়। ■

খোলা জানালা

জীবনের উৎপত্তি
বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ ও ধর্ম

– এ. আই ওপারিন

[আলেকজান্ডার ইভানোভিচ ওপারিন (১৮৯৪-১৯৮০) একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী। পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ওপারিন। জেবিএস হ্যালডেন ও জে ডি বার্নাল হলেন ওপারিনের উত্তরসূরী। ওপারিন 'জীবনের সৃষ্টি' তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মস্কোর রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদালয়, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর প্রাণ রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্ব সামলেছেন। জড় বস্তুর প্রাণ্দ্বেপান্তরের 'তাত্ত্বিক দিশা 'ওপারিন তত্ত্বে'র জনক তিনি। এখন নবম-দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানে ওপারিন তত্ত্বের বিষয় পড়ানো হয়।

'অরিজিন অব লাইফ' শীর্ষক এ লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে। আমরা এ লেখাটি সংগ্রহ করেছি 'সোসাল ফার্মাকোলজি' ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যা থেকে যা সংগৃহীত হয়েছে 'অরিজিন অফ লাইফ' বই থেকে। প্রকাশক : দীপায়ণ : ২০ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট। কলকাতা : ৭০০ ০০৯।

– সম্পাদক, সমীক্ষণ]

জীবন কী ? কেমন করে এর উৎপত্তি হল ? প্রশ্নটি প্রকৃতি বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলির অন্যতম। শিক্ষা যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সচেতনভাবে বা অন্যভাবে নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে এবং কোনও-না-কোনও ভাবে এর উত্তর তৈরি করে নেয়। এই প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে, সবচেয়ে আদিম কোনও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠতে পারে না।

স্মরণাতীত কাল থেকেই জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটি মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে আসছে। প্রশ্নটি সম্পর্কে গভীরভাবে মনোযোগ দেননি, এমন কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় বা চিন্তাবিদদের নাম করা যাবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালে, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রশ্নটির সমাধানের কথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু সমস্ত কালেই প্রশ্নটিকে অবলম্বন করে আদর্শগতভাবে ভিন্ন দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরের মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম চলে আসছে। **শিবির দুটি হলো বস্তুবাদ ও ভাববাদ।**

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমরা সাধারণত একে দুটি জগতে ভাগ করি – একটি জীবজগৎ এবং অন্যটি অজৈব জগৎ বা জড়-জগৎ।

অসংখ্য ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে জীবজগৎ গঠিত। কিন্তু এই প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, মানুষ থেকে ক্ষুদ্রতম জীবাণু পর্যন্ত সমস্ত জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই একটি সাধারণ জিনিস আছে, যার দ্বারা অজৈব জগৎ থেকে ক্ষুদ্রতম জীবাণুকেও পৃথক করা যায়। সবচেয়ে প্রাথমিক ধারণায় এই সাধারণ 'জিনিসটিকেই' আমরা জীবন বলে থাকি।

কিন্তু জীবনের উপাদানটি কী? জগতের অবশিষ্টাংশের মতোই জীবনের উপাদান কি বস্তুময়, নাকি এর উপাদান কোনও আধ্যাত্মিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল, যা অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না?

জীবন যদি বস্তুময় হয়, তাহলে এর নিয়মগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করা সম্ভব এবং সচেতন ও প্রণালীবদ্ধভাবে এর বাহকের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাও সম্ভব। কিন্তু জীবন যদি কোনও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং এর উপাদান যদি অজ্ঞেয় হয়, তাহলে আমরা জৈব প্রকৃতিকে অসহায় দর্শকের মতো দেখব এবং আধ্যাত্মিক উৎপত্তির রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের ভূমিকা হবে অসহায় দর্শকের মতো।

ভাববাদীরা সব সময় জীবনকে কোনও মহিমাময়, আধ্যাত্মিক অবস্তুময় সত্তারূপে ব্যাখ্যা করে – যেমন 'আত্মা', 'প্রাণশক্তি', 'স্বর্গীয় কারণ' ইত্যাদি। তাদের চোখে বস্তু জীবনহীন, নিশ্চল। এই বস্তু থেকেই প্রাণময় বস্তু গঠিত হয়। এবং তারা জোরের সঙ্গে বলে যে এটি তখনই বিদ্যমান হতে পারে যখন এতে আত্মা দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হয়, যা আবার বস্তুকে আকার ও গঠন প্রদান করে।

জীবন সম্পর্কে এই ভাববাদী ধারণা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি। মতের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করে যে মহান ভগবান নশ্বর ও প্রাণহীন বস্তুতে জীবন্ত আত্মা দ্বারা নবজীবন সঞ্চারিত করেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। শরীর পরিত্যাগ করার সময় এটি পচনশীল মৃতদেহ রূপে একটি শূন্য খোলক ফেলে যায়। তাদের মতে জীবন হচ্ছে স্বর্গীয় ভাবনার ফল, যেজন্য মানুষ এর উপাদান জানতে পারে না অথবা একে চালান বা নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারে না। জীবনের উপাদান সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সব ধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্ত। এটি ব্যতীত কোনও ধর্মীয় শিক্ষা অচিন্ত্যনীয়।

এই বিষয়টিকে বস্তুবাদ সম্পূর্ণ উল্টোদিক থেকে বিচার-

বিশ্লেষণ করে। বস্তুবাদ এই মত পোষণ করে যে জগতের অবশিষ্টাংশের মতো জীবনের উপাদানও বস্তুময়। এর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কখনও ওই অতি প্রাকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। **জীবন হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের একটি বিশেষ রূপ। এই উৎপত্তি ও বিকাশ বিশেষ নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ, বিষয়গত অভিজ্ঞতা এবং জীবন্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণই হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের বিশ্বস্ত পথ।**(জোর সংযোজিত)

জীবনের বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবনবিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস আমাদের দেখায় যে সামাজিক ঐতিহাসকি ক্রিয়াকলাপ, অভিজ্ঞতা, বিষয়গত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জীবন প্রকৃতিকে বস্তুবাদী পদ্ধতি বা প্রণালীতে অনুশীলন করার উপযোগিতা রয়েছে। মানুষের স্বার্থে ও সাম্যবাদ গড়ার স্বার্থে জীবনের উপাদান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে এবং সচেতন ও প্রণালীবদ্ধভাবে জীবন্ত প্রকৃতিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে বস্তুবাদই পথ দেখায়।

জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য যে অসংখ্য, একের পর এক বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা জীবন-বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। অন্যদিকে ভাববাদের যে একের পর এক পরাজয় ঘটেছে, তা-ও জীবন-বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। তবুও দীর্ঘদিন ধরে একটা সমস্যা ছিল যার কোনও আপাত বস্তুবাদী সমাধান উপস্থিত করা যাচ্ছিল না, যেটাই আবার বিভিন্ন ধরনের ভাববাদী ধাপ্পাবাজির উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সেই সমস্যাটি হচ্ছে জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত।

আমরা প্রতিদিন দেখি যে সব জীবন্ত প্রাণীই তাদের নিজেদের মতো জীবের জন্ম দেয় – একজন মানবী একটি মানবশিশুর জন্ম দেয়; একটি গরু একটি বাছুরের জন্ম দেয়; একই প্রজাতির মাছের ডিম থেকে সেই ধরনের মাছের উদ্ভব হয়; একই গাছের বীজ থেকে সেই ধরনের গাছের জন্ম হয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে এই একই ঘটনা সব সময় ঘটতে পারে না। আমাদের পৃথিবীর একটি আরম্ভ ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে – এই পৃথিবীতে সব প্রাণী ও উদ্ভিদদের পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব ঘটল কেমন করে?

ধর্মীয় ধারণানুসারে, ভগবান বিভিন্ন ধরনের সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেছিলেন। এই স্বর্গীয় সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমানের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদদের পূর্বপুরুষদের পৃথিবীতে আবির্ভাব যুগপৎ ও পূর্বনির্মিত আকারে ঘটেছিল। এভাবে, মানবজাতির পিতা প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল অনুসারে ভগবান ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন; তিনি তৃতীয়দিনে উদ্ভিদদের, পঞ্চমদিনে মাছ ও পাখিদের, ষষ্ঠ দিনে জীবজন্তুদের এবং অবশেষে মানুষ, প্রথমে পুরুষ, পরে নারী সৃষ্টি করলেন। ভগবান অজৈব পদার্থ মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ, আদমকে গড়লেন, এরপর এতে আত্মা প্রবেশ করিয়ে তাতে প্রাণসঞ্চার করালেন।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণের বিচার-বিশ্লেষণহীন ব্যাখ্যা থেকেই, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্পূর্ণ ও সংগঠিত আকারে হঠাৎ বা আকস্মিক উৎপত্তির গালগল্প শেখা যায় ধর্মের ইতিহাস অনুশীলন করলে।

এভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে মনে করা হত যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা ও গতিহীন, এবং আরও মনে করা হত যে সূর্য একে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে সমুদ্র ও পর্বতের পেছনে অস্ত যায়। একই ধরনের ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ মানুষকে শেখায় বিভিন্ন প্রাণী (যেমন পোকামাকড়, কৃমি এবং এমনকী মাছ, পাখি ও ইঁদুর) শুধুমাত্র এদের নিজেদের মতনই সন্তান উৎপাদন করে না, এরা কাদা, সার, মাটি ও অন্যান্য অজৈব বস্তু থেকে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হতেও পারে। যখন মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে অসংখ্য জীবন্ত জীবদের সাক্ষাৎ পায়, তখন সে একটাকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব বলে ব্যাখ্যা করে। এমনকী অজ্ঞ লোকেরাও স্থিরনিশ্চিত যে কৃমিরা সার পচা মাংস থেকে উৎপন্ন হয়। গার্হস্থ্য বিভিন্ন পরজীবীরা অস্তিত্বহীন কোনও কিছু থেকে ময়লা, ধুলো, গোবরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আসল কথা হল – তাদের ভাসাভাসা দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় যে ময়লা, ধূলিকণা হচ্ছে এদের আশ্রয়স্থল ও বাসা যেখানে পরজীবীরা ডিম পাড়ে, যা থেকে জীবের নতুন বংশধরদের উদ্ভব ঘটে।

ভারত, ব্যাবিলন ও ইজিপ্টের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে কৃমি, মাছি, মৌমাছিরা সার ও ময়লা থেকে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মায়; মানুষের ঘর্মে উকুন, নীলনদের কাদা থেকে ব্যাঙ, সাপ, ইঁদুর, কুমির এবং বহ্ন্যুৎসব থেকে আগুনে-মাছির হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম হয়। স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির এইসব কাহিনী ধর্মীয় রূপকথার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। জীবকূলের হঠাৎ আবির্ভাব ভগবান ও অসুরদের সৃষ্টিশীল ইচ্ছার রূপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইতিপূর্বে প্রাচীন গ্রীসের অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক জীবন্ত জীবদের উৎপত্তির এইসব ধর্মীয় ব্যাখ্যা বাতিল করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক প্লেটোর ভাববাদী শিক্ষা বিকশিত হয়েছিল ও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

তাঁর অবস্তুবাদী ধারণানুসারে, উদ্ভিদ ও প্রাণীরা আপনা থেকে প্রাণময় হয় না এবং এটি হতে পারে শুধুমাত্র 'আত্মা'–অবিনশ্বর আত্মার দ্বারা। প্লেটোর এই বিশ্বাস বা ধারণা আলোচ্য সমস্যাটির সমাধানে একান্ত নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিশ্বাস অন্য আর-একজন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের শিক্ষার মধ্যে

কিছু পরিমাণে লক্ষ করা যায়, যা আবার মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি বা সভ্যতার মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দু হাজার বছর ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

অ্যারিস্টটল তাঁর লেখাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবের ঘটনা-বলীর কেবল উল্লেখই করেননি, তিনি এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও উপস্থিত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্য সাকার বস্তুর মতো জীবন্ত বস্তুরও সৃষ্টি হয়েছে কোনও নিষ্ক্রিয় উৎস যেমন জড়পদার্থের সঙ্গে, কোনও সক্রিয় উৎস, যেমন আকারের, সংযোগের ফলে। সমস্ত জীবন্ত জীবের আকার হচ্ছে 'শরীরে প্রাণশক্তি' বা আত্মা যা শরীর গঠন করে ও একে সক্রিয় করে। অতএব জড়পদার্থ জীবনের অধিকারী হয় না, বরং এর দ্বারা অবলম্বিত হয়, নকশা অনুসারে সৃষ্ট ও আত্মার ক্ষমতার সাহায্যে সংগঠিত হয়, যে-আত্মা একে জীবন্ত করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে।

পরবর্তী সময়ে অ্যারিস্টটলের মতবাদ জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটি সমাধানে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী যুগে সব দার্শনিক সম্প্রদায়, সে গ্রীক বা রোমান যাই-ই হোক, জীবের হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে হঠাৎ বা আকস্মিক উদ্ভবের তত্ত্বটি ব্যাখ্যায় আরও বেশি বেশি করে ভাববাদী এবং এমনকি রহস্যমূলক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল।

বিশেষ করে আমাদের যুগের প্রারম্ভে নব্য-প্লেটোবাদী প্লটিনাস, যিনি এই সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন এবং যাঁর প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী ছিল, শিক্ষা দিলেন যে সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছে বস্তুর বা জড়পদার্থের সঙ্গে জীবনদায়ী আত্মার রূপান্তরের ফলে। প্লটিনাসই সম্ভবত 'প্রাণশক্তি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, এবং যা আধুনিক প্রাণশক্তিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞানীদের মনে আজও সক্রিয় আছে।

প্রাচীন খ্রিস্টানরা জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটির সমাধানে বাইবেলকে বিশ্বাস করত। বাইবেল আবার ইজিপ্ট এবং ব্যাবিলনের রহস্যকাহিনী সমূহ থেকে এর তথ্যাদি গ্রহণ করেছিল। চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রিষ্টীয় চার্চের পিতা হিসেবে পরিচিত যাজক সম্প্রদায় জীবনের উৎপত্তির রহস্যময় ধারণানুসারে ও নব্য প্লেটোবাদীদের শিক্ষানুযায়ী এই কাহিনীগুলিকে সম্পাদনা করলেন এবং এগুলি আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টীয় বিধান বা অনুশাসনে সযত্নে রক্ষিত আছে।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত থাকা ক্যাসারিয়ার বিশপ সেন্ট ব্যাসিল ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় শিক্ষা দেন যে ভগবানের আদেশে পৃথিবী নিজেই বিভিন্ন বীরুৎ উদ্ভিদ, মূল ও বৃক্ষ এবং পঙ্গপাল, কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, সাপ, ইঁদুর, পাখি ও বানমাছদের সৃষ্টি করে। সাধু লিখলেন যে 'ভগবানের আদেশ' এখনও পর্যন্ত অফুরন্ত কর্মক্ষমতা হিসেবে কাজ করে চলেছে।

সেন্ট ব্যাসিলের সমসাময়িক এবং ক্যাথলিক গির্জার কর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি সেন্ট অগাস্টিন-ও খ্রিষ্টীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে জীবন্ত জীবকূলের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলিতে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন যে ঘটনাটি ভগবানের খেয়াল মাফিক ঘটেছিল, যিনি জড় বস্তুকে 'জীবন-দানকারী আত্মা' ও 'আত্মিক বীজ' দ্বারা জীবন্ত করে তোলেন। এভাবে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির শিক্ষাকে খ্রিষ্টীয় অনুশাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সুসংহত করে তুললেন।

মধ্যযুগে বিজ্ঞান বিরোধী এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে বজায় রইল। এই সময়ে যে কোনও দার্শনিক ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় খোলসের মধ্যে অথবা চার্চতত্ত্বের পোশাকের মধ্যে বিদ্যমান থাকত। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি অবজ্ঞা সহকারে পরিত্যক্ত হল। প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয়, বরং বাইবেল অনুশীলন করে এবং ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতে মানুষ তার ধারণা গড়ে তুলল। শুধুমাত্র গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা সংক্রান্ত অতি অল্প কিছু তথ্য প্রাচ্যদেশ থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল।

অ্যারিস্টটলের রচনাবলীর প্রায়শই ভুল অনুবাদ ইউরোপীয় জনগণের কাছে পৌঁছত। তাঁর শিক্ষাকে প্রথমে ভয়ানক বিপজ্জনক বলে মনে করা হত, পরবর্তী সময়ে চার্চ যখন উপলব্ধি করল যে তাদের বহু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর শিক্ষাকে মানিয়ে নেওয়া যাবে, তারা অ্যারিস্টটলকে 'প্রকৃতি-বিজ্ঞানে যিশু খ্রিষ্টের পূর্বপুরুষ' হিসেবে গুণকীর্তন করতে শুরু করল। লেনিন সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন (ভি. আই. লেনিন–ফিলসফিক্যাল নোট্স্) – 'বলাবাহুল্য যে মধ্যযুগীয় দার্শনিকরা ও পাদ্রিতন্ত্র অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে প্রাণবন্ত বস্তুর বদলে প্রাণহীন বস্তু গ্রহণ করলেন।' বিশেষভাবে জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে জীবকূলের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির শিক্ষাটি ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, খ্রিষ্টীয় ধর্মগুরুদের চোখে যার সারবস্তু হচ্ছে 'অবিনশ্বর স্বর্গীয় আত্মার' দ্বারা জীবনহীন বা জড় বস্তুর জীবন্ত বস্তুতে পরিণত হওয়া।

উদাহরণস্বরূপ আমরা পাঠকদের কাছে মধ্যযুগের সবচেয়ে কুখ্যাত ধর্মগুরু টমাস অ্যাকুইনাসের নাম উল্লেখ করতে পারি। 'দেবদূতসম চিকিৎসকের' শিক্ষা আজ পর্যন্ত ক্যাথলিক গির্জার কাছে শুধুমাত্র গোঁড়া দার্শনিক মত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেন্ট টমাস তাঁর রচনাবলীতে জোরের সঙ্গে উল্লেখ

করেছিলেন যে জীবনহীন বস্তুতে প্রাণসঞ্চারের মাধ্যমে জীবকুলের সৃষ্টি হয়েছে। পচনশীল সমুদ্রের পাঁকে এবং সার দেওয়া মাটি থেকে এমনি করে ব্যাঙ, সাপ ও মাছের উদ্ভব ঘটে। সেন্ট টমাস বলেন যে, এমনকী যে-কীটেরা পাপীকে নরকে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়, সেই কীটরা পচনশীল পাপ থেকে উৎপন্ন হয়। সেন্ট টমাস সাধারণত পৈশাচিক বিদ্যার অত্যুৎসাহী প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন। দানব ও দৈত্য দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অতিশয় স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। যে জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে শুধু ভগবানের ইচ্ছায় পরজীবীদের উদ্ভব ঘটে তা-ই নয়, দানব ও অন্য দূরাত্মাদের চক্রান্তের ফলেও এদের উদ্ভব ঘটেছিল। ইঁদুর ও অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গাদি প্রেরণ করে শস্য নষ্ট করার অভিযোগে এইসব নিয়ম কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মধ্যযুগে 'ডাইনিদের' বহু ক্ষেত্রে বিচার করা হত।

টমাস অ্যাকুইনাসের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমী গির্জার প্রভুরা স্বতঃউদ্ভব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে একটি বিধান চালু করেছিল, সেটি হচ্ছে জীবনহীন জড় পদার্থে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা প্রাণসঞ্চারের বিধান বা মতবাদ।

পূর্বদেশের গির্জার প্রভুরা হুবহু সেই একই বিধান দৃঢ়ভাবে সমর্থন করত। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পিটারের সমসাময়িক, রস্তভের বিশপ দিমিত্রি এই বিধানটির পক্ষে এমনভাবে ওকালতি করতেন, আধুনিক কালে যা বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তিনি লিখলেন যে মহাপ্লাবনের সময় নোয়া তাঁর জাহাজে ইঁদুর, ব্যাঙ, বিছা, আরশোলা, মশা এবং অন্যান্য জীবদের গ্রহণ করেননি, যা 'পাঁকযুক্ত জলাশয়ে ও পচনশীল বস্তুতে জন্মায় এবং স্বর্গের শিশির দ্বারা গর্ভবতী হয়।' এইসব জীব মহাপ্লাবনের ধ্বংস হয় এবং 'মহাপ্লাবনের পর এরা আবার একই পদার্থ থেকে আর্বিভূত হয়।'

খ্রিষ্টধর্মের মত অন্যান্য ধর্মগুলিও আজও একই মত পোষণ করে যে জীবন্ত জীবরা বস্তুর নিজস্ব বিকাশ-নিরপেক্ষভাবে পূর্বনির্মিত অবস্থাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সৃজনশীল কার্যকলাপের ফলে আবির্ভূত হয়েছে এবং হচ্ছে।

তবে, জীবন্ত প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে এই পৃথিবীতে আমাদের চারপাশের পরিবেশে কখনওই জীবন্ত জীবদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব ঘটেনি। কৃমি, পোকামাকড়, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীর মতো উন্নত জীবদের ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এটি প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ের গবেষণায় এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা দেখতে পাই না অথচ পৃথিবীর মাটি, জল, বায়ুর সব জায়গাতে বিদ্যমান এমন কম উন্নত জীব, যেমন সরলতম জীবাণুদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

বেঠিক পর্যবেক্ষণ ও অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যাখ্যার পরিণামে জীবন্ত জীবদের হঠাৎ উৎপত্তির বিষয়টি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যার ওপর ভিত্তি করে সব ধর্ম জীবনদানকারী আত্মার দ্বারা মৃত, বস্তুর জীবন্ত হয়ে ওঠার ঘটনাটি প্রচার করার চেষ্টা করেছে এবং যা জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটির ধর্মীয় সমাধানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

জীবনের উৎপত্তির ধর্মীয় ধারণাকে উনবিংশ শতাব্দী আর একটি বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিল। **চার্লস ডারউইন** এবং রাশিয়ার বিজ্ঞানী **কে. এ. তিমিরিয়াজেভ, এ. ও** এবং **ভি. ও কোভালেভস্কি ভ্রাতৃদ্বয়** এবং **আই. আই. মেচনিকভ**-সহ অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছিলেন যে এখনকার মতো প্রাণী ও উদ্ভিদরা পৃথিবীতে সবসময় বসবাস করেনি, যার উল্টোটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল জোরের সঙ্গে প্রচার করত। উচ্চ জাতের উদ্ভিদ এবং মানুষ সমেত প্রাণীরা হঠাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি, বরং উন্নত জীবদের ক্রমবিকাশের ফলে গ্রহটির অবস্থানের সর্বশেষ যুগগুলিতে আবির্ভূত হয়েছিল। কম উন্নত জীবরা আবার এদের পূর্বে বসবাসকারী সরলতম জীবের বিকাশের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। সবচেয়ে আদিম সরলতম জীবরা এদের আগে পৃথিবীতে বসবাস করত।

কয়েক লক্ষ বছর আগে বসবাসকারী এইসব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা করে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে ঐ সময়ের জীবন্ত জীবরা এখনকার মতো নয়, যতই আমরা পেছনের দিকে অগ্রসর হই, জীবরা ততই সরলতম ও কম বহুমুখী হয়।

এই সিঁড়ির নিচের দিকে ক্রমশ নামলে এবং জীবনের অধিকতর আদিম ধাপ-সমূহ সযত্নে পরীক্ষা করলে আমরা বর্তমানের ক্ষুদ্র জীবদের সমগোত্রীয় এমন ধরনের আদিম জীবের সাক্ষাৎ পাই যারা একসময় পৃথিবীর একমাত্র অধিবাসী ছিল। এবং এখানেই প্রশ্নটি অনিবার্যরূপে ওঠে : **পৃথিবীতে বসবাসকারী সব জীবের পূর্বপুরুষ জীবন্ত প্রকৃতির সবচেয়ে সরলতম ও আদিম উদ্ভবের উৎস কী?**

বস্তুময় জগতের বিকাশের বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষভাবে জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনার ধারণাকে খন্ডন করে প্রকৃতিবিজ্ঞান জীবনহীন বস্তুর জীবনে রূপান্তরের ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হল। অর্থাৎ জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটি সমাধানে ব্রতী হল।

'অ্যান্টি ড্যুরিং' এবং **'ডায়ালেক্টিক্স অফ নেচার'** নামক দুটি ইতিহাস-সৃষ্টিকারী গ্রন্থে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাফল্যসমূহের বিচক্ষণ সাধারণীকরণ করে **ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্** জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটি সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করলেন। এবং তিনি এ বিষয়ে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার

পথনির্দেশ করলেন, যাকে অনুসরণ করে সোভিয়েত জীবনবিজ্ঞান সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষভাবে জীবের উদ্ভবের সম্ভাবনার মতবাদকে এঙ্গেলস অবৈজ্ঞানিক হিসেবে বর্জন করলেন এবং জীবনহীন প্রকৃতির সঙ্গে জীবন্ত প্রকৃতির অভিন্নতা প্রমাণ করলেন। বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে জীবনের উদ্ভবের আগে প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনকে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত বস্তুর গুণগত রূপান্তর অনুযায়ী তিনি জীবনকে বস্তুর ক্রমবিকাশের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন।

জীবনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজগতের ক্রমবিকাশের ফলে উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদদের সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করাই ডারউইনের মহান কৃতিত্ব। অবশ্য, জীবন সৃষ্টির সমস্যার ব্যাখ্যায় পুরনো অধিবিদ্যাগত প্রবণতা ডারউইন-পরবর্তী বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও বর্তমান। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত **মেন্ডেল** ও **মর্গ্যানের** শিক্ষাই এই ধারণা গড়ে ওঠার জন্য দায়ী যে বংশগতি ও অন্য সব চারিত্রিক গুণের বাহক হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ক্রোমোসোমের মধ্যে অবস্থিত একটি বিশেষ জিন পদার্থের কণিকাসমূহ। এ-ও বলা হয় যে এই কণিকাগুলি পৃথিবীতে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে এবং জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে এদের জীবন নির্ধারণকারী গঠন মূলত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে। তাহলে মেন্ডেল-মর্গ্যান মতবাদ অনুসারে জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটি এই প্রশ্নে এসে পর্যবসিত হয় যে, সমস্ত জীবন-বৈশিষ্ট্য ধারণাকারী জিন কণিকার হঠাৎ আবির্ভাব কী করে ঘটল?

এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন এমন অধিকাংশ বিদেশী লেখকরা (যেমন ফ্রান্সের **ডেভিলার্স** ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **আলেকজান্ডার**) অতিশয় অপরিণত উপায় অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতানুসারে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরমাণুসমূহের দৈবাৎ 'শুভ' সংযুক্তির ফলে আকস্মিকভাবে জিন অণুর আবির্ভাব ঘটেছিল, এরা 'নিজেরাই' নিজের জটিল অণু গঠন করল এবং যা তৎক্ষণাৎ জীবনের সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করল।

কিন্তু তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে এই 'শুভ ঘটনা' এত বিরল ও অসাধারণ যে পৃথিবীর বয়সের কোনও-এক সময়ে শুধুমাত্র একবারই এটি ঘটে থাকতে পারে। একবার মাত্র উদ্ভূত একটি শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল জিন পদার্থের অবিরত পুনরুৎপাদন তখন থেকেই হয়ে চলেছে।

আসলে এই ঘোষণা কোনও কিছুই ব্যাখ্যা করে না। সমস্ত জীবন্ত জীবের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্তিত্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে পুষ্টি, শ্বসন, বৃদ্ধি ও জননের মতো জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য অবস্থা অনুসারে জীবন-প্রক্রিয়ায় তাদের অভ্যন্তরীণ জৈব-সংগঠন পুরোপুরি সঠিকভাবে অভিযোজিত করে নেওয়া। তাহলে এমনকী সবচেয়ে আদিম জীবন-আকারদের পক্ষে এত বৈশিষ্ট্যমূলক এই অভ্যন্তরীণ অভিযোজন নিছক আকস্মিক ঘটনার ফলে কেমন করে উদ্ভূত হয়েছে?

একদিকে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নিয়ম নির্ধারিত প্রক্রিয়াকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বাতিল করে এবং অন্যদিকে এই বিশাল ঘটনাকে পৃথিবীর ইতিহাসে আকস্মিক বলে প্রচার করে, উপরোক্ত মতের সমর্থনকারীরা এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এবং জীবন সৃষ্টিতে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ও ভগবানের আদিম সৃষ্টিশীল ইচ্ছার চূড়ান্ত ভাববাদী ও রহস্যময় ধারণার আশ্রয় নেয়। **ই. শ্রডিংগার** কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'জীবন কী? জীবন্ত কোষের ভৌতধর্ম' গ্রন্থে, আমেরিকার জীবনবিজ্ঞানী **আলেকজান্ডারের** 'জীবন, এর প্রকৃতি ও উৎপত্তি' নামক গ্রন্থে এবং বুর্জোয়া লেখকদের অসংখ্য গ্রন্থে আমরা দেখি যে তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার চেষ্টা করে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটিকে – যেটি যে কোনও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে গুরুতর সমস্যা – বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাধান করা যাবে না।

অবশ্য তাদের এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং এটি সহজেই খন্ডন করা যায়, যদি শুধুমাত্র সঠিক ও প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক দর্শন অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে প্রশ্নটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে জীবন বস্তুময়। অবশ্য জীবন সাধারণভাবে বস্তুর অবিচ্ছেদ্য ধর্ম নয়। জীবন শুধুমাত্র জীবন্ত জীবের ধর্ম; অজৈব জগতের বিভিন্ন বস্তুতে জীবন অনুপস্থিত। বস্তুর রূপান্তরের বিশেষ রূপ হচ্ছে জীবন। কিন্তু এই বিশেষ রূপ স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না, অজৈব বস্তু থেকে এটি অনতিক্রম্য ফারাক হিসেবে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং বিপরীতক্রমে পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারায় এটি এক নতুন ধর্ম বা গুণ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। (জোর সংযোজিত)

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ শেখায় যে বস্তু কখনওই স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে না; এটি অবিরত গতিশীল, বিকাশশীল এবং ক্রমবিকাশের ফলে উচ্চ স্তরে আরোহণ করে এবং বেশি বেশি করে গতিশীলতার জটিল ও নিখুঁত আকার ধারণ করে। ক্রমবিকাশের উচ্চতর স্তরে আরোহণের পর বস্তু এমন এক অদ্ভুত গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা আগে ছিল না। জীবন হচ্ছে ঠিক সেই

গুণ বা বৈশিষ্ট্য। বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে এটি ঘটে। অতএব এটা স্পষ্ট যে জীবনের উৎপত্তি প্রশ্নটি সমাধানের সহজ পথটি হচ্ছে বস্তুর বিকাশের ইতিহাস অনুশীলনের পথ। এটাই সেই ক্রমবিকাশের স্তর যা নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়–বা জীবনের আবির্ভাব ঘটায়।

জীবনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বতঃজনন ঘটেছিল বলে অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জীবনের আবির্ভাব হঠাৎ ঘটেনি। এমনকী সবচেয়ে আদিম জীবন্ত জীবের শরীরের গঠনও এতই জটিল যে এর হঠাৎ আবির্ভাব সম্ভব নয়; এদের শরীর যে-যে বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি সেইসব পদার্থের দীর্ঘসময় ধরে ক্রমরূপান্তরের মাধ্যমেই শুধুমাত্র এদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। পৃথিবী গঠনের সময় এবং এর শৈশবকালে বহুযুগ আগে এই রূপান্তরসমূহ ঘটেছিল। জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটির সঠিক সমাধানের জন্য এইসব রূপান্তরের এবং আমাদের পৃথিবীর গঠন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অবশ্যই আমাদের অনুশীলন করতে হবে।

ভি. আই. লেনিনের **'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে বিবর্তনমূলক পদ্ধতির পরিণামে জীবনের উৎপত্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, এটা আমরা লক্ষ করি। তিনি লিখেছেন, 'প্রকৃতিবিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করে যে পৃথিবী একসময় এমন অবস্থায় ছিল যখন কোনও মানুষ অথবা অন্য কোনও জীবের অস্তিত্ব ছিল না অথবা থাকতে পারত না। জৈব বস্তুর উপস্থিতি হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা যা দীর্ঘ বিবর্তনের পরিণাম।'**

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে **জে. ভি. স্তালিন ও তাঁর 'অ্যানার্কিজম অর সোশ্যালিজম'** গ্রন্থে বস্তুবাদের মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করার সময় ক্রমবিকাশের ফলে জীবনের উৎপত্তির বিষয়টি জোরের সঙ্গে উপস্থিত করলেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে পৃথিবী একসময় উত্তপ্ত অগ্নিময় ছিল, পরে ধীরে ধীরে শীতল হয়েছে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের ফলে কোনও-এক প্রজাতির বনমানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, এদের বিবর্তনের ফলে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

'মোটামুটি এভাবেই প্রকৃতির বিবর্তন ঘটেছে।'

উল্লেখ করা দরকার যে জে. ভি. স্তালিন যখন এই বক্তব্য পেশ করেন, এঙ্গেলসের **'ডায়ালেকটিকস অফ নেচার'** গ্রন্থটি তখনও প্রকাশিত হয়নি, এবং তখনও অধিকাংশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (প্রগতিশীলরাও) জীবনের উৎপত্তির বিষয়টিকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতেন। বর্তমান শতাব্দীর শুধুমাত্র দ্বিতীয় দশক থেকেই এই প্রশ্নটির সমাধানকল্পে বিবর্তনমূলক চিন্তাভাবনা আরম্ভ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক কে. এ. তিমিরিয়াজেভের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। '১৯১২ সালের বৈজ্ঞানিক ঘটনাপঞ্জি থেকে' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি জীবনের উৎপত্তির বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন, 'আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে অন্যান্য বস্তুর বাস্তব প্রক্রিয়ার মতো একইভাবে জীবন্ত বস্তুর বিবর্তনীয় পদ্ধতিতে বিকাশ ঘটেছে' এবং বিবর্তনীয় প্রকল্প সেটা কেবলমাত্র **জীবনবিজ্ঞান অবলম্বনে করেছে তা-ই নয়, বরং মহাকাশবিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মতো অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানও গ্রহণ করেছে।** এটি আমাদের দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়েছে যে এই প্রক্রিয়া অজৈব থেকে জৈব জগতে অতিক্রমণের সময়েও সম্ভবত ঘটেছিল।

আমাদের দেশে যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যাকাডেমিসিয়ান **ভি. এল. কোমারভের** 'উদ্ভিদের উৎপত্তি' গ্রন্থটি। মহাকাশীয় স্পোরের দ্বারা পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল, এই ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনের শাশ্বত স্বভাবের তত্ত্বকে পরীক্ষা ও খণ্ডন করে কোমারভ লেখেন, **'জৈবরসায়ন তত্ত্বই হচ্ছে জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। জীবনের উৎপত্তি হচ্ছে পদার্থের সাধারণ বিবর্তনের ক্রমিক ধাপসমূহের একটি ধাপমাত্র – কার্বন নাইট্রোজেন যৌগের জটিল শৃংখলের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়।'**

আমাদের সময়ে বস্তুর বিবর্তনমূলক পদ্ধতি শুধুমাত্র সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাই গ্রহণ করেননি, আমাদের বিদেশী বন্ধুদেরও অনেকেই এটি গ্রহণ করেছেন। ধনতান্ত্রিক দেশের গবেষকরা জীবন্ত জীবের আবির্ভাবের পূর্বে বস্তুর বিবর্তনের শুধুমাত্র সেই যুগে এই পদ্ধতিটি স্বীকার করেন বা প্রয়োগ করেন অথবা কাজে লাগান। বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপে যখন তারা পৌঁছয়, তখন তাঁরা 'শুভ ঘটনা' অথবা অবাস্তব ভৌত শক্তির যান্ত্রিক অবস্থানে ফিরে আসেন।

জীবনের উৎপত্তির সমস্যাটির সম্মুখীন হয়ে আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রথম জীবের আবির্ভাবের প্রসঙ্গে বস্তুর ক্রমবিকাশের সঠিক চিত্র আঁকার জন্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রত্যেক ধাপের বিশ্লেষণের ও জীবনের বিবর্তনে যে-প্রক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলি প্রকাশ করার আহ্বান জানায়।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

‘বাণিজ্যিক স্বার্থে’ ইসরো-র গগণচুম্বি সাফল্য

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা – ইসরো – অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরি কোটা থেকে –

(ক) ২৮শে অগাস্ট একটি নতুন স্ক্র্যামজেট রকেট ইঞ্জিন সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে। এই বিশেষ ইঞ্জিনটি পরিবেশ থেকে জ্বালানি স্বরূপ অক্সিজেন সংগ্রহ করতে সক্ষম। ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি বহন করতে হয় না এবং এই ইঞ্জিন ব্যবহার এর ফলে রকেট উৎক্ষেপণের খরচ কমিয়ে ১০ ভাগের একভাগ করা সম্ভব।

(খ) ৮ই সেপ্টেম্বর ‘জি এস এল ভি–১ ও ৫’ রকেটকে ভর করে উৎক্ষেপণের ১৭ মিনিটের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ “ইনস্যাট ৩ডি আর” কক্ষপথে স্থাপিত হয়। ইসরো সূত্রে জানা গেছে জ্বালানি সমেত উপগ্রহটির ভর ২২১১ কিলোগ্রাম। এই উপগ্রহটির মাধ্যমে সাগরের উষ্ণতা নিখুঁত ভাবে মাপা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এই উপগ্রহ থেকে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ছবি তোলার ব্যবস্থা আছে এবং প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর উপগ্রহ চিত্র পাওয়া সম্ভব। ফলে সাগরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা বাড়বে।

(গ) ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬৭৫ কিলোগ্রাম ভরের মোট ৮টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় “পি এস এল ভি সি-৩৫” রকেট। ৮টি উপগ্রহের মধ্যে আলজেরিয়ার ৩টি, আমেরিকার ১টি, কানাডার ১টি এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী স্ক্যাটস্যাট সহ ভারতের ৩টি। এটি ইসরোর মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে দীর্ঘতম ও জটিলতম মিশনে বিরাট সাফল্য। এই উৎক্ষেপণের বিশেষত্ব হলো একই রকেট মারফৎ উপগ্রহগুলিকে দুটি ভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপিয়ান স্পেস রিসার্চ এজেন্সির ভেগা রকেট ভিন্ন এই বিরল কৃতিত্ব এখনো পর্যন্ত অন্য কোন দেশ অর্জন করতে পারে নি।

(ঘ) ২০১৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ঐ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ১০৪ টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে ইসরোর পি এস এল ভি-সি ৩৭ রকেট মহাকাশে পাড়ি দেয়। উৎক্ষেপণের ১৮ মিনিটের মধ্যে মহাকাশে পৌঁছে যায় এবং ২৮.৪২ মিনিটের মধ্যেই ১০৪টি উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে স্থাপিত হয়। এর আগে ২০১৪ সালে রাশিয়া থেকে সর্বাধিক ৩৭টি উপগ্রহ একত্রে মহাকাশে পাঠান হয়েছিল। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে খবরে প্রকাশ হয়েছিল ২০১৭ সালে জানুয়ারি মাসে ইসরো একসঙ্গে ৮৩টি উপগ্রহ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাস্তবে তা ঘটল ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ৮৩টির বদলে ১০৪টি উপগ্রহ নিয়ে। এই ১০৪টি উপগ্রহের মধ্যে ভারতের তিনটি, বাকিগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯৬টি, ইসরাইল, কাজাখস্থান, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি করে স্যাটেলাইট ছিল।

এই সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোর প্রশংসা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন – “গর্বের মুহূর্ত” এবং এবছর বাজেটে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ২৩% বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্য ওয়াশিংটন পোষ্ট লিখেছে, কম খরচে মহাকাশ গবেষণার ভারত পথিকৃত হয়ে উঠেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে, মহাকাশ নির্ভর নজরদারি ও গবেষণায় ভারত এখন প্রধান অংশীদার। সি এন এন জানিয়েছে – “আমেরিকা, রাশিয়ার কথা ভুলে যান। চোখ রাখুন ভারতের দিকে”।

এবারের ১০৪টির মধ্যে ভারতের ৭১৪ ভরের কারটোস্যাট-২ উপগ্রহটি রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে জমি ব্যবহার, জলবন্টন, রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাবে। বিদেশি স্যাটেলাইটগুলির কোনটির ভর ১০ কেজির বেশি নয় –এগুলি ন্যানো স্যাটেলাইট। ইসরোর চেয়ারম্যান এ এস কিরণ কুমার সহ বিদেশি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, এগুলি আগামী পাঁচ বছর প্রতিটি স্যাটেলাইট প্রেরকদের কাছে নিয়মিত তথ্য পাঠাবে।

এযাবৎ ইসরোর পক্ষ থেকে সফলভাবে ২২৬টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে ১৮০টি বিদেশি। ফোন, ইন্টারনেট সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাগুলির উন্নত প্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থার বাণিজ্যিক প্রসারে বিভিন্ন কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রের সহযোগিতায় মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাতে শুরু করেছে। তাই বাণিজ্যিক উপগ্রহগুলি মহাকাশে পাঠাতে খরচও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বর্তমানে ইসরো থেকে উপগ্রহ পাঠানোর খরচ সবচেয়ে কম। ২০১৩ সালে ইসরো থেকে মনুষ্যহীন মঙ্গলযান পাঠাতে খরচ হয়েছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। বিপরীতে নাসার মাভেন মার্স মিশনের খরচ পড়েছিল ৬৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের আর্থিক দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ‘অ্যান্ট্রিক্স’ বা ‘অন্তরীক্ষ’র সি এম ডি বলেছেন এবার ১০১টা বিদেশী স্যাটেলাইট পাঠিয়ে তারা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করেছে। ইসরোর এক বিজ্ঞানীর কথায় ইতিমধ্যে বহুদেশ এবং বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু কোম্পানি ইসরোর মাধ্যমে তাদের

উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নাসা জানিয়েছে যে ন্যানো টেকনোলজির know how ইসরো কে দেওয়া হবে। ভারতে এখনও প্রাইভেট কোম্পানি বা ব্যক্তিস্বার্থে উপগ্রহ সঞ্চালন ও উৎক্ষেপণ আইনত সিদ্ধ নয়। তবে এই আইনের বদলের দাবি উঠেছে এবং ভবিষ্যতে তার বদল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। ভারতে মহাকাশ গবেষণা ও কার্য পরিচালনার জন্য ইসরো তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অ্যান্ট্রিক্স কর্পোরেশন গঠন করেছে। এই সংস্থাই বিদেশী সংস্থাগুলির সাথে চুক্তি করে স্বল্পমূল্যে উৎক্ষেপণ করে ভাল বাণিজ্য করছে।

ভারতে মহাকাশ গবেষণা ও কার্যপরিচালনার জন্য প্রথম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হল হুগস নেটওয়ার্ক, যা ৬ বছর আগে গঠিত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্রডব্যান্ড ডাটা পরিষেবার জন্য। এই সংস্থাকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া প্রায় পাকা হয়ে গেছে। এই কোম্পানীর দাবি তারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষকে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেয় স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে। সংস্থার প্রেসিডেন্ট ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন 'এখন উপগ্রহ ব্যবসায় অনুমতিদান অতীতের চেয়েও আসন্ন।'

সুতরাং মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে মহাকাশ-সবই বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ■

চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত দৈত্যাকার রেডিও টেলিস্কোপ

সম্প্রতি চীন এক দৈত্যাকার রেডিও টেলিস্কোপ বানিয়েছে যার নাম দিয়েছে অ্যাপারেচর স্কেরিক্যাল রেডিও টেলিস্কোপ। এর আগে ক্যারিবিয়্যান দ্বীপপুঞ্জের পুয়েত্রো রিকোর টেলিস্কোপটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম। আজ থেকে ১৭ বছর আগে চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১১ সালে গুইজহু প্রদেশের কার্স্ট উপত্যকায় ১০ কিমি এলাকা জুড়ে এর পরিকাঠামো গড়ে তোলা শুরু হয়। ১৮০ মিলিয়ন ইউয়ান খরচ করে বিশাল এলাকা জুড়ে ৪৪৫০ টি প্যানেল বিশিষ্ট এই টেলিস্কোপটি গড়ে তোলা হয়। চীনের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক দপ্তরের শীর্ষকর্তা ঝোং জিয়াওনিয়ান জানিয়েছেন টেলিস্কোপটির আয়তন ৩০টি ফুটবল মাঠের আয়তনের সমষ্টির সমান। আশা করা হচ্ছে মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপটি ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

মানবদেহের মেসেন্টারি নতুন অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেল

মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এক অস্পষ্ট ক্ষুদ্র অংশ, অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেল। এই নতুন আবিষ্কৃত অঙ্গটিকে নিয়ে মানব দেহে এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত অঙ্গের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭৯টি। এই নতুন অঙ্গটির নাম মেসেন্টারি। এটি পেরিটোনিয়ামের দ্বিস্তর পাতলা আবরণ/ঝিল্লী যা পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্তকে উদর গহ্বরের অন্তঃপ্রাচীরের সঙ্গে জুড়ে রাখে। যদিও এই অঙ্গটির কাজ কী, তা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তবে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, মেসেন্টারি-এর কাজ জানতে পারলে, উদর সম্পর্কিত বহু রোগের কিনারা করা যাবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বাধিক গ্রহণীয় গ্রন্থ GRAY'S ANATOMY তে Prof Susan Standring বলেছেন মেসেন্টারির সঙ্গে শল্য চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। লিয়ানার্দো দা ভিঞ্চি এর বর্ণনা দিয়েছেন। বৃটিশ সার্জান, Frederic Trevar, ১৮৮৫ খ্রীঃ সুস্পষ্টভাবে মেসেন্টারির কথা উল্লেখ করেছেন। Trevar, রানী ভিক্টোরিয়া ও রাজা এডওয়ার্ড-৭ এর গৃহ চিকিৎসক ছিলেন যিনি সর্বপ্রথম অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন করেন। এই অপারেশন প্রসঙ্গে Trevar মেসেন্টারি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরও পূর্বে অস্ট্রীয় ডাক্তার Carl Toldt (1879) উদর গহ্বরের ডান ও বাম পার্শ্বে এর অবস্থান লক্ষ্য করেন। ১৯৪২ খ্রীঃ, Edward - Congdon উদর গহ্বরে ক্ষুদ্রান্তের সঙ্গে মেসেন্টারির সম্পর্ক উল্লেখ করেন। ১৯৮৬ খ্রীঃ রেডিওলজিস্ট Wylie J. dodds মেসেন্টারিকে Peritonial fold রূপে ব্যাখ্যা করেন। ২০১০ খ্রীঃ Limerick University এর গবেষকরা মেসেন্টারিকে অঙ্গ রূপে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব রাখেন। ২০১২ খ্রীঃ ইলেকট্রন মাইক্রোসস্কোপে মেসোকোলন, মেসো অ্যাপেন্ডিক্স, মেসোরেক্টাম, মেসোসিগময়েড ধরা পড়ে – শল্য চিকিৎসায় যা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর চার বছর ধরে আরও তথ্য হাজির করা হয় মেসেন্টারিকে সুস্পষ্ট অঙ্গ রূপে স্বীকৃতি আদায়ের। এ বিষয়ে তাদের গবেষণা পত্র The Lancet Gostroenterology & Hepatology তে প্রকাশিত হয়। এরপর, চিকিৎসাবিজ্ঞানে, বিশ্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বই GRAY'S ANATOMY তে মেসেন্টারিকে নতুন অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আয়ারল্যান্ডে ইউনিভার্সিটি হসপিটাল লিমারিক এর বিশেষজ্ঞ জে ক্যালিভিন এটির আবিষ্কারক। ■

‘ওসাইরিস রেক্স’ অ্যাস্টারয়েডের বুকে পদচারণার পথে

১৯৯৯ সালে, জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের এক গ্রহাণু (অ্যাস্টারয়েড) সন্ধান মিলেছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল “Bennu”। এই “বেন্নু”র কক্ষপথে পারি জমাতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ আমেরিকার ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল মহাকাশ গবেষনা কেন্দ্র থেকে “অ্যাটলাস-৫” রকেটে চেপে রওনা হয়েছে মহাকাশযান – “ওসাইরিস-রেক্স”। হিসাব মতন ২০১৮ সালে “ওসাইরস-রেক্স” মহাকাশযানটি ঢুকে পড়বে “বেন্নু”র কক্ষপথে। তারপর টানা ২ বছর ধরে ঐ কক্ষপথ বরাবর চলে “বেন্নু”র একেবারে কাছে পৌঁছে যাবে। ২০২০ সালে “ওসাইরিস-রেক্স” শুরু করবে “বেন্নু”র থেকে উপাদান সংগ্রহের কাজ। কাজ শেষ করার পর আরও এক বছর থাকবে বেন্নুর কক্ষপথে। এরপরে শুরু হবে তার “রিটার্ন জার্নি”। ২০২৩ সালের সেপ্টম্বর মাসে, ‘ওসাইরিস-রেক্স’ পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছে – “বেন্নু” থেকে সংগৃহীত উপাদানগুলি ক্যাপসুল সমেত প্যারাস্যুটের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা অনুযায়ী ক্যাপসুলটি উটা মরুভূমিতে পড়ার কথা। যদিও “বেন্নু”র বর্তমান গতিপথ অনুযায়ী ২১৭৫-২১৯৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার সম্ভাবনাও আছে। তবে আর যাই হোক মানব সভ্যতার ইতিহাসে অ্যাস্টারয়েডের বুকে “পদচিহ্ন” আঁকার এটাই প্রথম পদক্ষেপ। ■

গুজরাতে সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরের খোঁজ মিলল

সম্প্রতি গুজরাতের কচ্ছের রানে ধোলাভিবায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে একটি সুপ্রাচীন সুপরিকল্পিত বন্দর-নগরের সন্ধান মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের দাবি এই শহরটি ছিল সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর – যার গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে ৫০০০ বছরে আগে। গোড়াপত্তনের দেড় হাজার বছরের মাথায় এক ভয়ঙ্কর সুনামিতে ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যায় গোটা শহরটা – বলে অনুমান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে নগরবাসীরা অভিজ্ঞতার নিরীখে সুনামির মত জলোচ্ছাসের বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিল। কেননা গোটা শহরটা ১৪ থেকে ১৮ ফুট উঁচু পাথর দিয়ে বানানো প্রাচীরে ঘেরা ছিল। ■

পুরুষ সিন্ধুঘোটকদের গর্ভধারণ জীব বৈচিত্রের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

পৃথিবী জীব বৈচিত্রের ব্যাপকতায় যেমন মনহারী, তেমনই ব্যতিক্রমের উপমায় পরিপূর্ণ। ব্যতিক্রমের চমকে অনেক সময়, “নিয়ম”, অসাড়তার প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে থমকে যায়। এমনই এক ব্যতিক্রম হলো কোন এক প্রাণীদের পুরুষরাই নাকি গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে! হ্যাঁ শুনে অবাক লাগলেও বাস্তবে প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রায় ৩৫টি প্রজাতির সিন্ধুঘোটক (Sea horse) এই প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। সাধারণভাবে জানা আছে প্রাণী রাজ্যে যৌন জনন প্রক্রিয়ায় অন্তঃনিষেকের মাধ্যমে বংশবিস্তারকারী প্রজাতিগুলির মহিলা/স্ত্রী প্রাণীদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করাটাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু সিন্ধুঘোটকের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ কি?

সম্প্রতি চায়নিজ একাডেমী অব সায়েন্স এর প্রফেসর কুইয়াং লিন এবং তার অনুগামীরা, সিন্ধুঘোটকের এই বিচিত্র জীবন চক্রের জন্য জিন সংক্রান্ত বিবর্তনের জটিলতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। Tiger tail Sea horse (Hippocampus comes) এর জিনোমে ২৩,৪৫৮ টি জিন ৫০১ এম বি আয়তনে অবস্থান করছে। বিবর্তনের ধারায় সিন্ধুঘোটকের জিনোমে বহু জিন যেমন বিলুপ্ত হয়েছে তেমনই বহু জিন সংযোজিত হয়েছে। সিন্ধুঘোটকের জিনোমে 6 copy expanded patristacin (Pastn) জিন ফ্যামিলি এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। যা মূলত বিবর্তনের পথে পুরুষ সিন্ধুঘোটককে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবে সক্ষম করে তুলেছে। সাধারণভাবে অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীদের স্ত্রী দেহে গর্ভধারণ ও ভ্রূণ বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয় patristacin জিন ফ্যামিলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এনজাইম দ্বারা ডিম্বাণুর চারিপাশে Chorion বিশ্লেষণের ফলে। Choriolytic এনজাইমের মাত্রার উপর এটা নির্ভর করে।

সিন্ধুঘোটকের জনন প্রক্রিয়ায় মহিলা সিন্ধুঘোটকের ডিম্বাণু পুরুষ সিন্ধুঘোটকের ব্রড পাউচ এ স্থানান্তরিত হয়। সিন্ধুঘোটকের জিনোমে ৬টি Pastn জিন সজ্ঞবদ্ধভাবে বিরাজ করে এবং এদের উপস্থিতির কারণেই পুরুষ সিন্ধুঘোটকের ব্রড পাউচ এ মধ্য ও শেষ গর্ভকালীন দশায় Choriolytic এর আধিক্য দেখা যায় – যা অন্যান্য প্রজাতির মহিলা প্রাণীদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং ব্যতিক্রম হয়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশে, নিয়মের নিয়মেই ব্যতিক্রম ঘটে। ■

সার্নের গবেষণাগারে 'অ্যান্টি হাইড্রোজেন' পরমাণুর সন্ধান মিলল

২০১৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল, "নেচার"-এ অ্যান্টি ম্যাটার রূপে অ্যান্টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সন্ধান পাওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়। ২৫ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের নিরলস অনুসন্ধানের ফলে, সুইজারল্যান্ডের জেনিভার অদূরে সার্ন এর ভূগর্ভস্থ আলফা গবেষণাগারে অ্যান্টিম্যাটার পরমাণু রূপে অ্যান্টি হাইড্রোজেন পরমাণুর দৃশ্যমান আলোকবর্ণালী ধরা পড়ে। তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্ক মাপাও সম্ভব হয়। প্রতিটি পদার্থের যেমন নিজস্ব আলোকবর্ণালী আছে, তেমনই প্রতিটি অ্যান্টিম্যাটারেরও নিজস্ব আলাদা আলোক বর্ণালী আছে। আর সেই আলোক বর্ণালী দেখেই প্রথম অ্যান্টিম্যাটার রূপে আবিষ্কৃত হলো অ্যান্টি হাইড্রোজেন পরমাণু। সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ও একটি অ্যান্টি প্রোটন থাকে। আর অ্যান্টি হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটি পজিট্রন ও একটি অ্যান্টি প্রোটন। এই আবিষ্কার বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি রহস্যের জট খোলার ক্ষেত্রে কার্যকারী হবে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। ■

টেকনিশিয়াম সংকট ও তার প্রতিকার

সম্প্রতি কানাডার ওন্টারিও প্রদেশের চকলিভার অঞ্চলে একটি পরমাণু চুল্লি মেরামত জনিত কারণে দেড় বছর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত একটি অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি করেছে। অনেকে হয়ত ভাববেন, সংকটটা কি কানাডার বিদ্যুৎ-সংকট যা ঐদেশের মানুষকে ভাবাচ্ছে? না, সংকটটা শুধুমাত্র ঐ দেশের মানুষের নয় বরং বিশ্বের বহুমানুষের চিকিৎসা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সংকটের স্বরূপ জানতে গেলে একটু প্রাক্-কথার প্রয়োজন রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হল।

সমস্ত পরমাণু চুল্লিতে জ্বালানী হিসাবে ইউরেনিয়াম নামক তেজষ্ক্রিয় মৌল ব্যবহার করা হয়। ঐ মৌলের বিয়োজনের ফলে নির্গত হয় বিশাল পরিমাণ পারমানবিক শক্তি যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এর পাশাপাশি পার্শ্বপদার্থ হিসাবে তৈরী হয় কিছু উপজাতদ্রব্য যা পুনপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয় ও তৈরী হয় কিছু বর্জ্যপদার্থ। পারমানবিক চুল্লির উপজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল মলিবডেনাম যা তৈরী হবার অব্যবহিত পরেই টেকনিশিয়াম নামক এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলে রূপান্তরিত হয়। এই টেকনিশিয়াম মৌলটি চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রধানতঃ বিভিন্ন রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। মানবদেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যথা অস্থি, মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ইত্যাদিতে রক্তচলাচলের মাত্রা স্ক্যানিং পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় যা ঐ সকল অঙ্গের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় ৭০,০০০ এমন পরীক্ষা বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে হয়ে থাকে। রেডিয়োলজি পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রায় আশি শতাংশ ক্ষেত্রেই টেকনিশিয়াম প্রয়োজন। বিশ্বে মোট টেকনিশিয়ামের চাহিদার প্রায় কুড়ি শতাংশই সরবরাহ করে কানাডার ঐ পারমানবিক চুল্লিটি। অবশিষ্ট আশি শতাংশ টেকনিশিয়াম যোগায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। গণিতিক হিসাব বলছে এর ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন প্রায় ১৪০০০ মানুষ এই রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবেন ও রোগ নির্ণয়ের অভাবে সঠিক চিকিৎসা হতেও বঞ্চিত হবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এমন সংকটের সৃষ্টি হবে তা যখন জানা ছিল তবে টেকনিশিয়াম মজুত করা হল না কেন? পরমাণু চুল্লি ছাড়া টেকনিশিয়ামের কি আর কোন উৎস নেই? যে চুল্লিগুলি চালু রয়েছে তার উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করেও টেকনিশিয়ামের চাহিদা কি পূরণ করা যেত না? পরমাণু চুল্লি থেকে প্রাপ্ত টেকনিশিয়াম অত্যন্ত অস্থায়ী যার অর্দ্ধায়ুষ্কাল মাত্র ছয় ঘন্টা তাই একে দীর্ঘদিন মজুত করা অসম্ভব। প্রকৃতিতে টেকনিশিয়াম মৌলটি খুবই নগণ্য। প্রতি কেজি ইউরেনিয়ামে মৌলটির উপস্থিতি মাত্র এক ন্যানোগ্রাম ($১০^{-৯}$ গ্রাম)। অন্যদিকে চালু পরমাণু চুল্লিগুলির উৎপাদন মাত্রা সীমিত যা ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আগামীদিনে এই মৌলের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সংকট আরও তীব্রতর হবে, পরমাণু চুল্লিগুলি মেরামতেরও প্রয়োজন হবে। তাহলে এই সংকটের সমাধানের উপায় কি?

বাস্তব পরিস্থিতিতে, যতদিন না টেকনিশিয়াম উৎপাদনের বিকল্প কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন পরমাণু চুল্লি হতে প্রাপ্ত উপজাত থেকেই তা সংগ্রহ করতে হবে। সামাজিক উৎপাদনে শক্তির চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মেটানোর জন্য খনিজ উত্তোলন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে তার ব্যবহারের পাশাপাশি পারমানবিক শক্তির যথাযথ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই কর্মকান্ডে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলিকে দূর করার জন্য বিজ্ঞান যে সমস্ত পদ্ধতিগুলিকে আবিষ্কার করেছে তার যাতে যথাযথ প্রয়োগ যাতে হয় সেই লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার আন্দোলনই হল বিজ্ঞান মনস্কতা। ইদানিং পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, কেমিক্যাল

হাব এমনকি পাওয়ার গ্রীড স্থাপনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় কিছু পরিবেশবাদীদের অবৈজ্ঞানিক ভূমিকা সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই পত্রিকার মার্চ-২০১৪ সংখ্যায় 'পারমানবিক শক্তি কি মানব কল্যাণের অন্তরায়' – শীর্ষক নিবন্ধে এই বিষয়ে সবিস্তার চর্চা রাখা হয়েছিল। ঐ সংখ্যার সম্পাদকীয়-র অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল – "... যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ তথা স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পর আধুনিক পুঁজিবাদের সূচনাকাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিজের করায়ত্ব করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবেশের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানব সভ্যতাও কিছু মাত্রায় পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞান মনস্ক জনতা এই দিকটিকে উপেক্ষা করে না। বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার প্রয়াসও চলেছে। কিন্তু সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে তার লক্ষ্য মানবকল্যাণ নয়, মুনাফা আরও মুনাফা। এর ফলে প্রকৃতিকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা তারা নেয় না। বিশ্ব জুড়ে সমাজ সচেতন মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, আরও সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু তাপশক্তি বা পারমানবিক শক্তি সহ নানাবিধ উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে বলে তা বন্ধ করার দাবী কি প্রগতিশীল? যা আগামী বিকশিত সমাজের পক্ষে, তার পক্ষ নেওয়াই প্রগতিশীলতা নয় কি? কারণের অবসানে সংকল্পবদ্ধ না হয়ে ফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কি বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়?" পরিবেশবাদীরা কি বলেন? ■

২০১৬ ঃ বিজ্ঞানে নোবেল

চিকিৎসাশাস্ত্র ঃ কোষের আত্মভক্ষণ বিষয়ক (অটোফ্যাগি) ধারণা দেওয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রে এবার নোবেল পেয়েছেন**ওশুনোরি ওশুমি**। তিনি জাপানের টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক।

তিনি ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি তার গবেষণায় দেখান যে, দেহ নিজেই তার কোষ ধ্বংস করছে। তবে এই আত্মভক্ষণ কোষের একটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কোনো কারণে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে নিজের সুরক্ষার জন্য কোষ ধ্বংস করতে দেহ ওই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।

পাশাপাশি নতুন কোষের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে পুরনো কোষ এভাবেই তার আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করে। ১৯৮৮ সালে ইয়োশিনোরি ওশুমি প্রথম এই ধারণা দেন। তার গবেষণার প্রায় ৩০ বছর পর তিনি এ বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ এবার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

পদার্থ বিজ্ঞানে ঃ রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস ২০১৬-তে পদার্থ বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী **ডেভিড জে থুলেস, এফ ডানকান এম হালডেন ও জে মাইকেল কোস্টারলিটজের** নাম ঘোষণা করে। নিজেদের তাত্ত্বিক পাটাতনে পদার্থের আন্দোলিত অবস্থার দিশা দেওয়ার অবদানস্বরূপ এই তিন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানীকে পদার্থে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের গবেষণা ইলেকট্রনিক্সে বিপুল অগ্রগতি আনবে বলে আশা প্রকাশ করেছে সুইডিশ একাডেমি। এ গবেষণায় এক অজানা দশার সন্ধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে পদার্থ বিচিত্র বাস্তবতায় বদলে যেতে পারে। আমরা জানি পদার্থের অবস্থান তিনটি। কঠিন, তরল ও বায়বীয় – এই তিন অবস্থার একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় পদার্থ ওই বিচিত্র দশায় অবস্থান করে। এই দশাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এই তিন পদার্থবিদ। আর দশা শনাক্তকরণে তারা চমৎকার গাণিতিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। এই গাণিতিক ব্যবহার করার জন্যই তাঁদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের গবেষণায় তারা সুপার কন্ডাক্টর, সুপার ফ্লুইড ও পাতলা ম্যাগনেটিক ফিল্মের আচরণ বুঝতে উচ্চতর গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

তাঁদের গবেষণার ফলে ইলেকট্রনিক্সে নতুন সম্ভাবনার দিশা পাওয়া গেছে। ডেভিড জে থুলেস ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। আর এফ ডানকান এম হালডেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় যোগ দেওয়ার আগে ফ্রান্সে ফিজিসিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ফিনল্যান্ড এ জে মাইকেল কোস্টারলিটজ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন অল্টো ইউনিভার্সিটিতে। এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে দুই ভাগে। প্রথম ভাগের পুরস্কার পাবেন বিজ্ঞানী ডেভিড থুলেস। অন্য ভাগের পুরস্কার পাবেন বাকি দুই বিজ্ঞানী।

রসায়ন ঃ এবার রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী – ফ্রান্সের **জ্যাঁ পিয়েরে সাভেজ,** যুক্তরাজ্যের **স্যার জে ফ্রেজার স্টোডার্ট** এবং নেদারল্যান্ডসের **বার্নার্ড এল ফেরিঙ্গা**। সুইডিশ নোবেল কমিটির বক্তব্যে বলা হয়, বিশ্বের **'সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যন্ত্র'** তৈরির জন্য তিনজন যৌথভাবে এ পুরস্কার জিতেছেন।

তাঁরা তাঁদের গবেষণায় অণু সমতুল্য ক্ষুদ্রতম যন্ত্রের নকশা ও সংশ্লেষণ করেছেন। ন্যানো প্রযুক্তির ইতিহাসে এই গবেষণা নতুন একটি মাত্রা যুক্ত করেছে। তাঁদের অবদান রসায়নশাস্ত্রকে ভিন্নতর উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। সুইডেনে একটি সংবাদ সম্মেলনে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ■

ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ

জুলাই ২০১৬

১. লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের গবেষকরা জানালেন যে একটি নতুন টেট্রাকোর্য়াক কণার নতুন পরিবার আবিষ্কৃত হয়েছে যথা X(৪১৪০), X(৪২৭৪), X(৪৫০০) এবং X(৪৭০০)। (রিট্রাইভড্)

৪. নাসার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে জুনো স্পেসক্রাফ্ট অবতরণ করেছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৫. চীনা বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রেডিও টেলিস্কোপ বানানোর কাজ সমাপ্ত করেছেন। (রিট্রাইভড্)

১৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে জলীয় বাষ্পকে আটকানোর জন্য গ্রাফিন থেকে একপ্রচার প্যাকেট তারা উদ্ভাবন করেছেন যা জলীয় বাষ্পকে প্লাস্টিকের তুলনায় ১০ লক্ষ গুণ বেশি আটকাতে পারবে। (সায়েন্স ডেইলি)

২০. হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মাপের বর্হিবিশ্বের একটি গ্রহ প্রত্যক্ষ করলেন যা ট্রাপিস্ট-১ নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। (নেচার)

২৫. বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জীবন্ত সমস্ত ধরণের জীবের ৩৫৫ ধরনের জিনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন Last Universal Common Ancestor থেকে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস্)

২৯. প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে ক্ল্যারিওন-ক্লিপারটন অঞ্চল থেকে গভীর খননকার্য চালিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর জীব-এর সন্ধান পেলেন। এদের মধ্যে অধের্কের বেশি প্রজাতি জীবন বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

অগাস্ট ২০১৬

৩. জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা এটা সুনিশ্চিত করে বলেছেন যে বর্হিবিশ্বে পৃথিবীর ন্যায় কমপক্ষে ৪০০০টি গ্রহ আছে। নাসা'র কেপলার মিশন এই তথ্য জানিয়েছে। এদের মধ্যে ২১৬টি গ্রহ মোটামুটি মানুষের বাসযোগ্য হতে পারে। এর মধ্যে ২০টি হল সবচেয়ে উপযুক্ত যেখানে পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ভূত্বক আছে। (সায়েন্স ডেইলি)

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলের ইঞ্জিনিয়াররা ধূলিকণা মাপের এমন একটি তারবিহীন সেন্সর আবিষ্কার করেছেন যা মানব শরীরে বসানো সম্ভব। (রিট্রাইভড্)

১১. প্রাচীন যুগে শুক্রগ্রহ হয়ত জীবের বসবাসের উপযুক্ত ছিল যখন সেখানকার বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় অনেক কম ছিল এবং সেখানে পাতলা জলীয় সমুদ্রের আস্তরণ ছিল। (নাসা)

* গ্রীণল্যান্ডে একটি হাঙর পাওয়া গেছে যার বৈজ্ঞানিক নাম (Somniosus microcephalus) এই হাঙরটি হল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন (প্রায় ৪০০ বছর) বাঁচতে পারে এমন একটি মেরুদন্ডী প্রাণী। (সায়েন্স ডেইলি)

১২. লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের গবেষকরা এমন একটি সফটওয়ার উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে যে কোন ব্যক্তির হাতের লেখার প্রতিলিপি তৈরি করা সম্ভব। (বিবিসি নিউজ)

২৪. জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা সূর্যের সবচেয়ে কাছের একটি লাল বামন তারা (Proxima Centauri) আবিষ্কার করেছেন, যার একটি গ্রহ (Proxima b) হল পৃথিবীর আকারের গ্রহ, যেখানে জীবের বসবাস হয়ত সম্ভব। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্)

২৭. নাসার স্পেসক্রাফ্ট জুনো, গ্যাস দৈত্যগ্রহ বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করল। বৃহস্পতি পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৪২০০ কিমি দূরত্বে মেঘের উপর জুনো প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীতে বৃহস্পতির এত কাছে কোন স্পেসক্রাফ্ট অতীতে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি। (বিবিসি নিউস)

৩১. গ্রীণল্যান্ডের পাথরে সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ফসিলের সন্ধান মিলেছে। দক্ষিণ পশ্চিম গ্রীণল্যান্ডের পাথরেরস্তরে ঢেউ খেলানো গঠনযুক্ত এই ট্রেস ফসিলটি হল একপ্রকার স্ট্রোম্যাটোলাইট। এর বয়স রেডিওমেট্রিক পদ্ধতিতে নিধারিত হয়েছে প্রায় ৩৭০০ কোটি বছর। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্, বিবিসি নিউস)

সেপ্টেম্বর ২০১৬

২. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল আর্নল্ড এবং পদ্ম গোপালনের নেতৃত্বে একদল প্রযুক্তিবিদ এমন এক কার্বন ন্যানোটিউব উদ্ভাবন করেছেন যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা সিলিকন ট্রান্সিস্টারের ১.৯ গুণ। (ফিজ ও আর জি)

৮. জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সেঙ্কেবার্গ বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট রিসার্চ সেন্টারের প্রজননবিদ অ্যাক্সেল জাঙ্কে এবং নামিবিয়ার জিরাফ কনজারভেশন ফাউন্ডেশনের জুলিয়ান ফেসেসি জিরাফের জিন পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে জিরাফ আসলে একটি নয়, চারটি প্রজাতি (স্পিসিস) থেকে উদ্ভুদ হয়েছে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

* বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ১৬৬৫ সালে লন্ডনে ঘটে যাওয়া 'গ্রেট প্লেগ'এর জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হল Yersinia pestis। সংরক্ষিত মৃতদেহের কঙ্কাল-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্য জানা যায়। এই ভয়াবহ প্লেগ আক্রমণে ১৮ মাসের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ মারা যান। বিগত ৪০০ বছরে ইংলন্ডে ঘটা মহামারির মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। যদিও এর পরে এরকম

ঘটনা আর ঘটে নি। (বি বি সি নিউজ)

১০. এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বের সবচেয়ে বড় উল্কা (মিটিওরাইট) এর সন্ধান পাওয়া গেছে। Gancedo নামক এই মিটিওরাইট-টির ভর প্রায় ৩০ টন, যা আর্জেন্টিনায় পাওয়া যায়। (বি বি সি নিউজ)

১৩. ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি Gaia স্পেস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত প্রথম তথ্য প্রকাশ করল। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি-তে উপস্থিত কোটি কোটি নক্ষত্রের অবস্থান এবং উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এর মাধ্যমে। (বি বি সি নিউস)

১৬. নোকিয়া বেল ল্যাব, ডয়েশ টেলিকম টি ল্যাব, টেলিকম টি ল্যাব এবং টেকনিকাল ইউনির্ভাসিটি মিউনিখ এর গবেষকরা প্রতি সেকেন্ডে ১ টেরাবাইট (১ টেরাবাইট = ১০০০ গিগাবাইট) তথ্য সরবরাহকারী অপটিকাল ফাইবার প্রস্তুত করেছেন। (নোকিয়া)

২০. জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক টার্ডিগ্রেড বা ওয়াটার বিয়ার নামক এক জলজ প্রাণীর দেহস্থ প্রোটিন (ডিসাপ) কে যখন পরীক্ষাগারে মানব কোষের উপর স্থাপন করেন তখন দেখা যায় যে ওই প্রোটিন কোষস্থ ডি এন এ কে বিকিরণজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে। (নেচার কমিউনিকেশন)

২১. ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন এর জাশুয়া এম নেচার পত্রিকায় বলেছেন যে মানুসের ডি এন এ-র জেনেটিক গবেষণা করে এটা জানা গেছে যে আজ থেকে ৫০,০০০-৮০,০০০ বছর আগে যে সকল প্রাচীন মানবগোষ্ঠী আফ্রিকার বাইরে বসবাস করেছেন তারা কার্যত সকলেই আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া মানুষ। বিজ্ঞানীদের অনুমান বিভিন্ন মহাদেশে বসবাসকারী প্রাচীন মানুষেরা সকলেই আফ্রিকার একটি আদিম জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। এরা সকলেই আফ্রিকা থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৬. সৌরমন্ডলের বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে বুধগ্রহেও পৃথিবীর মত ভূ-আলোড়ণ ঘটে এবং তা ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় (Tectonically active)। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৭. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি-র নিউ হোপ ফার্টিলিটি সেন্টারে ডঃ জন ঝ্যাং এর নেতৃত্বে একটি টীম প্রথম তিন পিতা-মাতার সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন। এক মহিলার ক্ষতিগ্রস্থ মাইটোকনড্রিয়া যুক্ত ডিম্বাণু-কে অপর এক মহিলার ডিম্বাণুর সুস্থ সবল মাইটোকনড্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে প্রথমে একটি সুস্থ সবল ডিম্বাণুর জন্ম দেওয়া হয়। এরপর সেই ডিম্বাণুকে একজন পুরুষের শুক্রাণুর সাথে নিষেক ঘটিয়ে প্রথম মহিলার গর্ভে স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম তিন পিতা-মাতার সুস্থ সন্তানের জন্ম হয়। (বি বি সি নিউজ)

৩০. Rosetta মহাকাশযান ৬৭ পি নামক ধূমকেতুর উপর অবতরণ করে তার অভিযান সমাপ্ত করল। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

অক্টোবর ২০১৬

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-মিলওয়াকী বিশ্ববিদ্যালয়-তে করা এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে Caffeine রাসায়নিক গ্রহণ করার ফলে মহিলাদের মধ্যে ডিমনেশিয়া অসুখের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি প্রায় ৩৬ শতাংশ কমে যায়। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

* জাপানের ওশুনেরি ওশুমি কে অটোফোজী আবিষ্কারের জন্য শরীরবিদ্যা বা ওষুধশাস্ত্রে এবছর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। (নোবেল ফাউন্ডেশন)

৪. পদার্থের বহিরাগত কোয়ান্টাম অবস্থা এবং টোপোলজিকাল অর্ডার সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য ডেভিড থুলেস, এফ ডানকান এম হ্যালডেন এবং জন কোস্টারলিটজকে এবছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। (নোবেল ফাউন্ডেশন)

৫. আণবিক যন্ত্র (Molecular machine) আবিষ্কারের জন্য রসায়নে এবছর নোবেল সম্মান দেওয়া হয়েছে জঁ্যা পিয়েরে স্যাভেজ, স্যার জে ফ্রেজার স্টোডার্ট এবং বার্নার্ড এল ফেরিঙ্গাকে। (নোবেল ফাউন্ডেশন)

৬. ফ্রান্সের সেন্টার ন্যাশনাল দে লা রিসার্চ ইনস্টিটিউট গবেষণা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রক্সিমা বি নামক বর্হিজগতের গ্রহ (exoplanet)-এ মহাসমুদ্রের উপস্থিতি থাকতে পারে। (ফিজ ও আর জি)

৯. নিউ ইংলন্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে ঘাড় ও মাথার ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত নিভোলুমার, কেমোথেরাপির থেকে দ্বিগুণ সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া কিডনির ক্যানসারেও এই ওষুধের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা গেছে। (বি বি সি নিউজ)

১১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান এর পদার্থবিদ ডেভিড গার্ডসের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সূর্য থেকে প্রায় ১ হাজার তিনশ ৬০ কোটি কি.মি দূরে ২০১৪ইউ জেড২২৪ নামক এক নতুন বামন গ্রহের আবিষ্কার করেছেন। (সায়েন্স অ্যালার্ট)

১২. ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির হার্শেল স্পেস অবজারভেটরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা বলেছেন জীবনের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-হাউড্রোজেন অণু (CH), কার্বন-হাইড্রোজেন পজিটিভ আয়ন (CH^+) এবং কার্বন পজিটিভ আয়ন (C^+) আসলে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আগে মনে করা হত যে এগুলি তৈরির পিছনে সুপারনোভার মত ঘটনা দায়ী। (নাসার জেট প্রপালোশন ল্যাবরেটরি, ক্যালির্ফোনিয়া)

১৩. ইংলন্ডের ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম এর ক্রিস্টোফার

কনসেপিস এর নেতৃত্বে একদল জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বিগত ২০ বছর ধরে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ থেকে আগত বিভিন্ন ছবির ত্রিমাত্রিক ইমেজিং প্রযুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে দৃশ্যমান মহাবিশ্বে ২ লক্ষ কোটিরও বেশি নক্ষত্রপুঞ্জ উপস্থিত আছে। যা আগে করা ধারণা থেকে অনেক বেশি। (দ্য গার্ডিয়ান)

১৭. অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক এক নতুন ধরণের কোয়ান্টাম বিট (quantum bit) আবিষ্কার করেছেন যা সুপারপোজিশনে আগের থেকেও ১০ গুণ বেশি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিকস্ এর ক্ষেত্রে এ এক অনন্য আবিষ্কার। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

১৮. ওয়ার উইক ইউনিভার্সিটির গবেষকরা মানুষের মস্তিষ্কে ডিপ্রেশন বা হতাশার যথার্থ অবস্থান খুঁজে পেয়েছেন। অর্বিটোফ্রন্টাল কর্টেক্সে এর অবস্থান দেখা গেছে। এর ফলে ডিপ্রেশন বা হতাশাজনিত অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। (ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারউইক)

২১. ম্যাসাচুসেটস্ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা অ্যালকাটর সি মড টোকামাক নিউক্লিয়ার চুল্লিতে বায়ুমন্ডলের চাপের দ্বিগুণ চাপ সহ্য করার প্রযুক্তি প্রয়োগে সফল হয়েছেন। চুম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্ঠিত এই ধরণের চুল্লির এত চাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা হল এই প্রথম। (সায়েন্স ডেইলি)

২৭. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি-র অধ্যাপক মার্টিন ফ্রেজার এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ডঃ ডেভিড নরম্যান এর নেতৃত্বে গবেষকরা ইংলন্ডের সাসেক্স থেকে ডায়নোসরের মস্তিষ্কের টিস্যু-র জীবাশ্ম পেয়েছেন। বর্তমান যুগের কুমির ও পাখী-র ব্রেন টিস্যুর সাথে এই জীবাশ্ম-র ব্রেন টিস্যুর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। (ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ)

* সান্টা বারবারা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালির্ফোনিয়ার গবেষকরা একটি ন্যানো স্কেলের এমন কম্পিউটিং এলিমেন্ট আবিষ্কার করেছেন যার মাপ ৫০ ন্যানোমিটারের বেশি নয়। (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালির্ফোনিয়া, সান্টা বারবারা)

৩১. পেনসিলভেনিয়ার পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে স্ক্যানিং-এর গতি হাজার গুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। (পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি)

নভেম্বর ২০১৬

১. নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইউনিভার্সিটির গবেষক আলিপাশ ভাজিরি-র নেতৃত্বে একদল গবেষক দেখিয়েছেন মানুষের মস্তিষ্কে চিন্তাভাবনা বা আচরণ কোন একটি বা একধরণের নিউরন (নার্ভ কোষ) দ্বারা হয় না, এর পিছনে একাধিক নিউরনের সমন্বয় উপস্থিত থাকে। গবেষকরা এমন এক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন যার দ্বারা মস্তিষ্কের সব ধরণের কার্যকারিতা নথীবদ্ধ করা যায়। (সায়েন্স ডেইলি)

৩. বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে মানুষের মস্তিষ্ককে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রিসোর্স ইমেজিং পদ্ধতিতে যদি স্ক্যান করা যায় তবে তা 'মিথ্যা' ধরার ক্ষেত্রে পলিগ্রাফ টেস্টের থেকেও অনেক বেশি কার্যকরী হয়। (সায়েন্স ডেইলি)

৪. ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে)-র গবেষকরা ঘোষণা করেছেন যে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড সুপারহুইট বা গম সালোক সংশ্লেষ এর কার্যকারিতা ২০% থেকে ৪০% বাড়াতে পারে। ২০১৭ সালে ফার্মে এর আরও পরীক্ষা করা হবে। (ফার্মাসি ইউকলি)

৮. ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান হেল্থ সিস্টেমের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে স্টেম সেল থেকে প্রস্তুত ক্ষুদ্রাকারের ফুসফুসকে ইঁদুরের দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছেন। এর ফলে স্টেম সেল থেকে প্রস্তুত এই ফুসফুসের ত্রিমাত্রিক চিত্র বানানো সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে ফুসফুসজনিত রোগের গবেষণার ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করতে পারে। (সায়েন্স ডেইলি)

৯. ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স পরীক্ষাগারের গবেষকরা 'লিপটেন' নামক এমন এক 'অ্যালগোরিদম' তৈরি করেছেন যা লিপ রিডিং আরও ৪০% নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম। (ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড)

১৪. ১৯৪৮ সালের পর এই প্রথম চাঁদকে অতি বৃহৎ আকারে দেখা গেল। (বি বি সি নিউজ)

১৫. নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মাইক্রোবের জিনোমের মধ্যে কোন্ জিন অ্যান্টিবায়োটিক যৌগ তৈরি করে তাকে সফলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ওই যৌগকে বিশ্লেষণ করে তারা আরও দুটি উপযোগী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

১৬. সাল্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অন্ধ প্রাণীদের অন্ধত্ব আংশিকভাবে ঘোচানোর জন্য 'হোমোলজি ইন্ডিপেনডেন্ট টার্গেটেড ইন্টিগ্রেশন' নামক নতুন জিন এডিটিং তৈরি করেছেন। (দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট)

২১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনিসিনাটি চিলড্রেন্স হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারের গবেষকরা প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল থেকে অন্ত্রের টিস্যু প্রস্তুত করেছেন। এই অন্ত্রের টিস্যুতে বিভিন্ন কার্যকরী নার্ভের উপস্থিতি আছে। গবেষকরা এরপর অন্ত্রের নার্ভ ঘটিত রোগ Hirschsprung পুণরায় সৃষ্টি করে অন্ত্রের বিভিন্ন নার্ভ জনিত অসুখ নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই গবেষণা অন্ত্রের নার্ভজনিত রোগের চিকিৎসায় ভবিষ্যতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারবে বলে অনুমান। (সিনসিনাটি চিলড্রেন্স মেডিকেল সেন্টার)

২২. নাসা'র মার্স রেকোইনেসেন্স অরবাইটার মঙ্গলগ্রহের

ইউটোপিয়া প্ল্যানিটিয়া নামক অঞ্চলে ভূত্বকের নীচে এক বিরাট জলস্তরের সন্ধান পেয়েছে। এই জলস্তরে জলের পরিমাণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লেক সুপিরিয়র-এর চেয়েও বেশি। (নাসা)

২৫. লন্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা দ্বারা অনুমান করছেন যে আলোর গতি ধ্রুবক নয় পরিবর্তনশীল। এই গবেষণা আইনস্টাইনের মতামত – আলোর গতি ধ্রুবককে ভবিষ্যতে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। (সায়েন্স ডেইলি)

* ক্যালির্ফোনিয়া ইউস্টিটিউট অব টেকনলজির গবেষকরা সিলিকন-কার্বন বন্ড থেকে সজীব কোষ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রোটিন সবচেয়ে উপযোগী ভূমিকা নিয়েছে। (সায়েন্স অ্যালার্ট)

২৮. ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি (IUPAC) এর বিজ্ঞানীরা চারটি নতুন আবিষ্কৃত মৌলের নামকরণ করেলেন যথাক্রমে নিহোনিয়াম (Nh)১১৩; মস্কোভিয়াম (Mc)১১৫; টেনেসাইন (Ts)১১৭ এবং ওগানেসন (Og)১১৮। (আই ইউ পি এ সি)

৩০. ইউনিভার্সিটি অব লিস্টার (ইউ কে)-র গবেষকরা পৃথিবীর টেকনোস্ফিয়ারের ভর মেপে দেখলেন তা ৩০ ট্রিলিয়ন টন, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে নীচে গেলে প্রতি কি.মি-র ভর থেকে ৫০ কি.গ্রা বেশি। (সায়েন্স ডেইলি)

ডিসেম্বর ২০১৬

৮. মায়ানমারের মিতকিনতাতে একটি চড়ুই পাখির মাপের ডায়নোসরের লেজের জীবাশ্ম অবিকলরূপে অ্যাম্বার নামক উদ্ভিদের রেজিনে পাওয়া গেছে। যার বয়স ৯ কোটি ৯০ লক্ষ বছর। (বি বি সি নিউজ)

৯. জাপানের তোহকু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ভীষণ নমনীয় লিকুইড ক্রিস্টাল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাদি আরও বেশি নমনীয় এবং কার্যকরী হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

১৪. একটি গবেষণায় জানা গেছে যে সমুদ্র বা সিন্ধু ঘটক (sea horse) এর জিনোম সবচেয়ে দ্রুতগতিতে অভিযোজিত হওয়ার মত ফিস জিনোম। (নেচার)

১৯. সার্নের পরীক্ষাগারে আলফা (ALPHA) নামক এক পরীক্ষার দ্বারা অ্যান্টিম্যাটারের আলোক বর্ণালী এই প্রথম পর্যবেক্ষণ করা গেল। (সার্ন)

২২. আর ভি এস ভি নামক এক ভ্যাকসিন দ্বারা ইবোলা ভাইরাসকে ৭০-১০০% পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে। (সি এন এন)

২৯. মঙ্গলগ্রহে বসবাস স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য আবাসের নক্সা তৈরি করেছেন নাসা-র বিজ্ঞানীরা। এই আবাস উচ্চ তাপমাত্রা ও বিকিরণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। (নাসা)

জানুয়ারি ২০১৭

৪. মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি রাসায়নিক যৌগের প্রয়োগের মাধ্যমে মেলানোমা নামক একপ্রকার ত্বকের ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

৬. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র গবেষকরা একটি অত্যন্ত হাল্কা কিন্তু ভীষণ দৃঢ় পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যা ইস্পাতের চেয়ে ১০ গুণ বেশি দৃঢ়। গ্যাথাইন থেকে প্রস্তুত করা এই পদার্থটি ভবিষ্যতে নানাবিধ কাজে লাগবে বলে গবেষকদের অনুমান। (ফিজ ও আর জি)

৯. লন্ডনের কিংস কলেজের গবেষকরা অ্যালঝাইমার্স রোগের ওষুধ এর প্রয়োগে দাঁতের স্টেম সেল নতুনভাবে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দাঁতকে পুনরায় নতুনভাবে তৈরি করার সহজ পদ্ধতি পাওয়া গেল। (দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট)

১২. স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা টি জেড এ পি (TZAP) নামক এক প্রোটিনের সন্ধান পেয়েছেন যা ক্রোমোজোম-এর শেষাংশগুলিকে সংযোজিত করে এবং টেলোমার এর দৈর্ঘ্যও নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। (সায়েন্স ডেইলি)

১৬. জাপানের আকাতুসকি স্পেস প্রোব মিশন এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বুধ গ্রহ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ তে নির্গত যে তরঙ্গ ধরা পড়েছে তা সম্ভবত মাধ্যাকর্ষীয় তরঙ্গ। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৮. হাভার্ড স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এর গবেষকরা একটি এমন নমনীয় রোবট আবিষ্কার করেছেন যা মানুষের হৃদপিন্ডে প্রবেশ করিয়ে স্পন্দন সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এই অতি নরম নমনীয় রোবটটি-র সাহায্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদপিন্ড পুণরায় সচল করার প্রক্রিয়ায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। (সায়েন্স ডেইলি)

২৩. স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীরা একধরনের আধাকৃত্রিম স্থিতিশীল অতিক্ষুদ্র প্রাণীর (micro organism) এর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। যা বিভিন্ন ওষুধে ব্যবহার করা যাবে। (দ্য ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট)

২৬. সাল্ক ইনস্টিটিউট গবেষকরা এই প্রথম মানুষ ও শূকরের হাইব্রিড ভ্রূণ সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে দুটি প্রজাতিরই জেনেটিক ইনফরমেশন আছে। (বি বি সি নিউজ)

৩০. কঠিন লিথিয়াম দ্বারা প্রস্তুত একধরণের ব্যাটারি অত্যন্ত নিরাপদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিসে প্রকাশিত এই ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন দ্বারা প্রস্তুত ব্যাটারির সমকক্ষ। (পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস) ■

পাঠকের কলম

মুক্ত মনের আলোকে বিচার
গীতা কি জাতীয় গ্রন্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

–তপন চন্দ
মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ 'গীতা' কে জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনার প্রস্তাব রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। যেমন গত ২৫/১২/২০১৪ তারিখে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকায় মাননীয় বীরেশ চন্দ্র দত্ত (পশ্চিম জিৎপুর, আলিপুরদুয়ার) মহোদয়ের লেখা 'প্রস্তাব স্বাগত'। লেখক মাননীয় বীরেশ চন্দ্র মহোদয় তার রচনায় বলেছেন একসময় গীতা ছিল বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শক, গীতাকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে পথ নির্দেশক হিসেবে কিছু ব্যক্তিত্বের নামও তিনি তার পত্রে উল্লেখ করেছেন।

পত্রলেখকের প্রস্তাব অনুযায়ী বিরোধিতা করার জন্য গীতা উপহার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নাস্তিক্যবাদীরা ধর্মগ্রন্থ বেশি বেশি করে পড়ে ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানার জন্য। মাননীয় লেখক বিপ্লবী ভগৎ সিংহ-র নাম নিশ্চই শুনেছেন! লেখকের ব্যক্তি বিশ্বাস বোধে কারুর কিছু যায় আসে না।

ভারতে ধর্ম অনপেক্ষতা সাংবিধানিক এক বৈশিষ্ট্য। কাজেই প্রথমত জাতীয় গ্রন্থ বিষয়টিই পরিত্যাজ্য এক প্রস্তাব। দ্বিতীয়ত এমন প্রস্তাবের যোগ্য সর্বজনমান্য কোন গ্রন্থ আছে বলেও মনে হয় না।

গীতা হিন্দুদের কাছে ধর্মগ্রন্থরূপে আদৃত। গীতার বিখ্যাত উক্তি ঃ

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরোধর্ম ভয়াবহঃ"।

এখানে ১) স্বধর্ম কি আর পরধর্মই বা কি?

২) ধর্মের উদ্দেশ্য যদি নীতি নিষ্ঠ মঙ্গলদায়ক কাজই হয় সে তো সকলের জন্যই মঙ্গলদায়ক; সেখানে স্বধর্ম আর পরধর্মের কথা আসে কোথা থেকে?

৩) গীতা যে সময়ে রচিত হয়েছিল তা ছিল হিন্দু ধর্মের চরম দুঃসময়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক প্রসার হিন্দুধর্মকে অনেক খানি কোনঠাসা করে ফেলেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই সকল চ্যালেঞ্জের মূলে ছিল একদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং আচার অনুষ্ঠানের শীলিভূত ঐতিহ্য আর অর্থহীন আতিশয্য আর অন্যদিকে বংশানুক্রমিক বর্ণভেদজনিত অমানবিকতা আর সামাজিক অবক্ষয়। এই দুই বাধাকে উত্তরণ করে এক নতুন অবতারতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটানই ছিল গীতার প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণবাদ এবং নারী ও শুদ্রের হীনস্থানের তত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বাসনা ত্যাগ এবং স্থিতপ্রজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব সংযুক্ত করা হয়েছিল (সূত্রঃ 'সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবৎ গীতা', এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬)। তাছাড়া এই সময়ে জৈন ধর্ম, অজীবক ধর্ম প্রকৃতি অন্যান্য ধর্মও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। চার্বাকপন্থী লোকায়ত নাস্তিক্যবাদ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পর পর উত্তর পশ্চিম থেকে বহিরাক্রমণ এবং বিদেশীদের আর্যাবর্তে বসতিস্থাপনের ফলে তথাকথিত ম্লেচ্ছ ও যবনেরা ব্রাহ্মন্য ধর্মকে অগ্রাহ্য করত। আর পবর্তবাসী কিরাত এবং অরণ্যবাসী নিষাদ ও শবরেরা চিরকালই ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এই অবস্থায় শুঙ্গ রাজত্ব থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত রাজশক্তির সহায়তায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক ব্যাপক উদ্যোগ আরম্ভ হয়। ভগবদ্ গীতা তারই অন্যতম ফলশ্রুতি। (সূত্র ঃ 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ', জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিমার্স লিঃ কলকাতা, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬)।

গীতা হিন্দুদের কাছে ধর্মগ্রন্থরূপে আদৃত। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক মূল্য যাই হোক, ধর্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়ায় তা একটি ধর্মের কাছে পবিত্রতা পেয়ে থাকে। সর্বজনীন কোন গ্রাহ্যতা নেই। ধর্মগ্রন্থ নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাছে গ্রাহ্য, অন্য ধর্মের কাছে গ্রহনীয় হয় না। মানুষ ধর্মমুক্ত হয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেই তা একটি গ্রন্থের মূল্যে বিবেচিত হতে পারে। ধর্মগ্রন্থের ভাল-মন্দ দিক ধর্ম মুক্ত মানুষের দ্বারাই মূল্যায়ন সম্ভব। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছে ধর্মের ভাল-মন্দ বিচার্য নয়।

গীতায় কি আছে? ব্রহ্ম বিষয়ক রহস্যময়তার অনাবশ্যক বিষয়ের সাথে কিছু ভাল কথা আছে; কিছু ভাল কথা অনেক গ্রন্থেই থাকে। গীতায় যে দর্শন তুলে ধরা হয়েছে তা নিয়ে গভীর আলোচনা হতে পারে – পৃথিবীর প্রতিটি দর্শন নিয়েই

আলোচনা হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে। বিদ্যাসাগর বেদান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে গিয়েছেন। গীতা তার বাইরে নয়। ১৮টি অধ্যায়ে গীতায় উপদেশ দান করা হয়েছে। অর্জুন বিষাদযোগে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যুদ্ধে নানা কারণ দেখিয়ে অনাগ্রহী হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন। বাকি ১৭টি অধ্যায়ে কার্যত মুক্তিলাভের জন্য নানা পথের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো ঃ

সাংখ্যযোগ – মূলত আত্মার স্বরূপ নিয়ে লেখা।

কর্মযোগ – কর্মের আবশ্যকতা ও তার কৌশল, নিষ্কাম কর্ম।

জ্ঞানযোগ – অবতারতত্ত্ব, চর্তুবর্ণ, যজ্ঞের বর্ণনা, জ্ঞানের গুরুত্ব।

সন্ন্যাসযোগ – সন্ন্যাসীর মুক্তিচিন্তা, ধ্যানযোগ, ধ্যান ও সমাধি, যোগসিদ্ধির লক্ষণ, বৈরাগ্য।

জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ – পরমেশ্বরে বিধৃত জগৎ, ঈশ্বরলাভ।

অক্ষর ব্রহ্মযোগ – অবতার, যজ্ঞাদি, ভক্তি।

রাজযোগ – ভগবানের যোগৈশ্বর্য, যজ্ঞাদির ফল, ভক্তিদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি।

বিভূতিযোগ – ভগবানের বিভূতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান নিবৃত্তি।

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ – ভগবানের শক্তি ও কর্ম দর্শন।

ভক্তিযোগ – ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম, উপাসনার রকম।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ –ব্রহ্মের স্বরূপ, আত্মজ্ঞানের পথ।

গুণত্রয় বিভাগ যোগ – ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুণাতীতের লক্ষণ।

পুরুষোত্তম যোগ – সংসার ও বৈরাগ্য, পুরুষোত্তমের রূপ।

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ – দৈবী ও আসুরী সম্পদ বর্ণনা, নরকের দ্বার, শাস্ত্রবিধির গুরুত্ব।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ – আস্তিক্য বুদ্ধি, আসুরী বুদ্ধি, ত্রিবিধ সমস্যা।

মোক্ষযোগ – যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ত্রিবিধ কর্তব্য, নিষ্কাম কর্মযোগ।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার – কথা সাময়িকী, ১৫/১/২০১৫)

এই জাতীয় নানা বিষয় নিয়ে গীতা। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানান্বেষণের চিন্তা বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে গীতা পাঠ্য। কিন্তু আধুনিক বাস্তব জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। ধর্মগ্রন্থ ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। বিশ্বাসের সাথে যার সম্পর্ক তা কখনই ধর্মঅনপেক্ষ ভারতে সর্বজনীনরূপে 'জাতীয় গ্রন্থ' হতে পারে না। ■

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,

এই পত্রিকার মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় "মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর" শীরোনামে লেখাটিতে একটি তথ্য সঠিক নয়।দৃশ্যমান মহাবিশ্বে অর্ডিনারি ম্যাটার এর ঘনত্ব আর মহাবিশ্বের প্রসারণের হার থেকে হিসেব করা ভরশক্তির ঘনত্বের মধ্যে যে অমিল তা থেকে ব্ল্যাক হোলের ধারণার জন্ম হয়নি। ব্ল্যাক হোলেরঅস্তিত্ব এই সমস্যার মীমাংসাও করে না। বিজ্ঞানীরা এর মীমাংসা করার চেষ্টা আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য তাঁরা ডার্ক এনার্জির (এবং অন্যান্য কিছু অবসারভেশন বা পর্যবেক্ষণ থেকে ডার্ক ম্যাটারের) ধারণায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জির সম্বন্ধে তাদের জানা বোঝা এখনও অস্বচ্ছ।

আর একটা কথা আমার মনে হয় লেখাটিতে সরাসরি বললে ভাল হত। সেটা এই যে আইনস্টাইন এর জেনারেল রিলেটিভিটি (সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ) স্পেস টাইম-এ সিঙ্গুলারিটি-র অস্তিত্ব (ব্ল্যাক হোলের ভেতরে এবং বিগ ব্যাং এর সময়) প্রেডিক্ট করে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতিতে এরকম সিঙ্গুলারিটি থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে এরকম সিঙ্গুলারিটি জেনারেল রিলেটিভি-র প্রয়োগের সীমাবদ্ধতারই ইঙ্গিত বহন করে। এই ধরণের সিঙ্গুলারিটির কাছাকাছি স্পেস-টাইম-এর পদার্থবিদ্যা বোঝার ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের তত্ত্ব (যা কিনা একটা ক্লাসিকাল তত্ত্ব) যথেষ্ট নয়। এর জন্য আমাদের দরকার গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ-র একটা কোয়ান্টাম মেকানিকাল ডেসক্রিপশন বা বিবরণ যা এখনও আমরা পরিস্কার ভাবে জানিনা।

ইতি

সৌম্য

বেঙ্গালুরু

সম্পাদকের জবাব ঃ–

ভুল ধরিয়ে ধারণা পরিস্কার করে দেওয়ার জন্য পাঠককে অশেষ ধন্যবাদ। পত্রিকাকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখবেন এই আশা রাখি।

সম্পাদক

সমীক্ষণ

জিজ্ঞাসা ও তার সমাধান ঃ

সুনামি কি ও কেন ?

[প্রশ্ন ঃ সুনামি'র সময় মাঝসমুদ্রে ঢেউ-এর বিস্তার (wave length) অনেক বেশি কিন্তু উচ্চতা (amplitude) অত্যন্ত কম। কিন্তু পাড়ে বিস্তার কম কিন্তু উচ্চতা অত্যন্ত বেশি কেন?]

মূল প্রশ্নে যাবার আগে সাধারণ পাঠকদের জন্য জেনে নেওয়া দরকার সুনামি কী ও কেন?

সুনামি (Tsunami) শব্দটি একটি জাপানী শব্দ। অর্থগতভাবে Tsu মানে harbour বা বন্দর এবং nami মানে ওয়েভ বা ঢেউ। অর্থাৎ সার্বিক অর্থে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিকারী জলোচ্ছাস বা ঢেউ, যা কিনা প্রধানভাবে সমুদ্র পাড় বা বন্দর এলাকায় দেখা যায়। আগে সুনামিকে টাইডাল ওয়েভ বা জোয়ার (চাঁদের এবং আংশিকভাবে সূর্যের আকর্ষণে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সমুদ্রের জল ফুলে উঠে সমুদ্র বা সংলগ্ন নদীতে যে ঢেউ সৃষ্টি করে) ভাবা হত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ জানার পর বোঝা গেছে যে সুনামি জোয়ার নয়। সুনামির জলোচ্ছাস চন্দ্র-সূর্যের প্রভাবে বা ভূ-পৃষ্ঠের উপরকার কোন প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে হয় না। সমুদ্রের নিচের ভূত্বকে ভূ-আলোড়নের ঘটনা অমাবস্যা-পূর্ণিমা নির্বিশেষে যে কোন সময়ই ঘটতে পারে।

সুনামি'র কারণ বা উৎস কী?

১) সমুদ্রে তলদেশে (সামুদ্রিক ভূত্বক বা Oceanic crust) বড় মাত্রার (রিখটার স্কেলে ৭-এর অধিক) ভূমিকম্প (অগভীর ফোকাস হলে) এবং যে চ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হয় তা যদি সমুদ্রপৃষ্ঠকে ওঠা-নামা ঘটায় (নরমাল বা রিভার্স ফল্ট, স্ট্রাইক স্লিপ ফল্ট নয়)

২) সমুদ্রগর্ভে বড় মাত্রার অগ্নুৎপাত এবং তদ্‌জনিত ভূমিকম্পের ফলে

৩) সমুদ্রপাড়ের মহাদেশীয় ভূত্বকে বড় ধরণের ধ্বস

৪) সমুদ্রের মধ্যে বড় আকারের উল্কাপাত ঘটলে

৫) সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে সুনামির মত জলোচ্ছাসের উৎপত্তি হতে পারে।

প্রধানতঃ ভূমিকম্পই সুনামি'র কারণ। এই ভূমিকম্পের জন্য যে অসীম অনিয়ন্ত্রিত শক্তি উৎপন্ন হয় তা তরঙ্গের আকারে ত্রিমাত্রিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই অসীম অনিয়ন্ত্রিত শক্তি আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে ভূ-মধ্যস্থ ভরের শক্তিতে রূপান্তরের ফলেও উৎপন্ন হতে পারে $E = \Delta mc^2$ সূত্র অনুসারে, (যেখানে E = শক্তি, Δm = মাস ডিফেক্ট, C = শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ)।

এই শক্তি ভূ-গর্ভে প্রাইমারি বা পি ওয়েভ (শব্দের ন্যায় অনুভূমিক তরঙ্গ) বা সেকেন্ডারি বা এস ওয়েভ (আলোকের ন্যায় তির্যক তরঙ্গ)-এর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে তা Surface wave (Love wave এবং Rayleigh wave আকারে ছড়িয়ে পড়ে। Rayleigh wave ও Love wave একাধারে অনুভূমিক ও তির্যক তরঙ্গ।

এই ত্রিমাত্রিক তরঙ্গগুলি উৎপত্তিস্থল থেকে যত বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তত তার তীব্রতা কমতে থাকে। উৎসস্থলের কাছাকাছি মাধ্যমের কণাগুলির (এক্ষেত্রে জলকণা) উপর যত বেশি বল প্রযুক্ত হয় দূরত্ব অনুযায়ী তা কমতে থাকে। ফলে উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলে (এক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রে) শক্তি বেশি থাকায় তা ব্যাপক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেন্‌থ) নিয়ে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমের স্তরকে ঘনীভূত (compression) ও তনীভূত

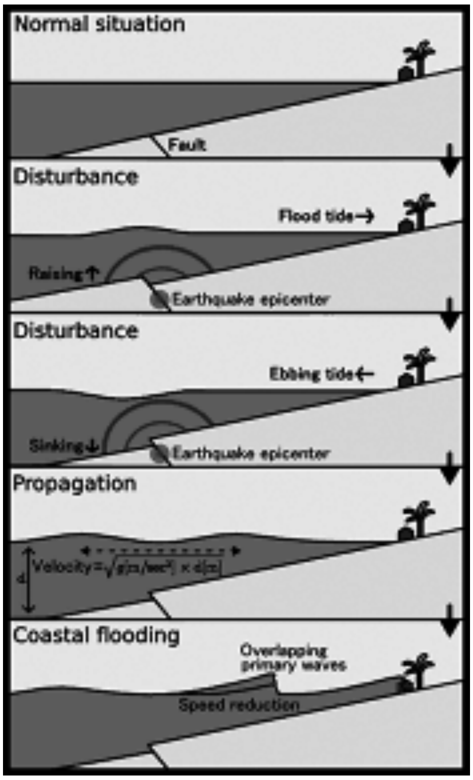

(rarefaction) করতে করতে দূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেহেতু একটি পূর্ণ ঘনীভবন + একটি পূর্ণ তনুভবন = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাই মাঝসমুদ্রে ঢেউ-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েকশ কিমি পর্যন্ত হয় কিন্তু ঢেউ-এর উচ্চতা ১ মিটারের কাছাকাছি থাকে। ফলে ওই সময় মাঝসমুদ্রের জাহাজের নাবিক ঢেউকে তেমনভাবে অনুভব করতে পারে না।

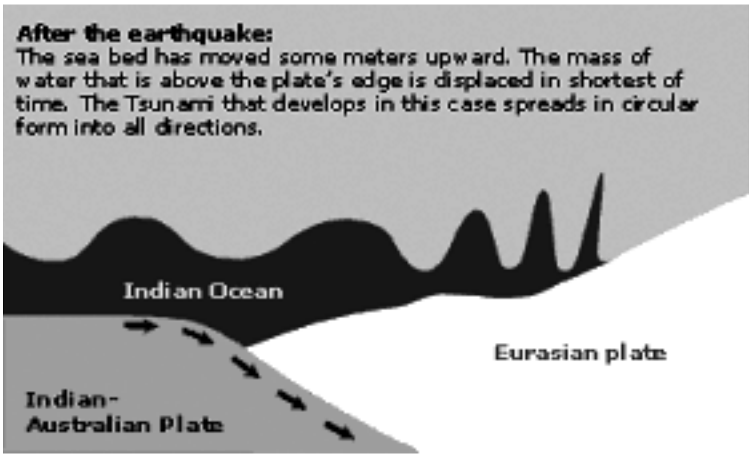

পাড়ের কাছে পৌঁছালে সমুদ্রপৃষ্ঠ খুব কাছে এসে পড়ে। কিন্তু ঘনীভবনের সময় মাধ্যমকে চতুর্দিক (উপর, নিচ সহ) সঙ্কুচিত করা হয়। তাই জলের গভীরতা কমে আসায় (ভূপৃষ্ঠ জলতলের কাছে আসায়) জল উপরিতল বরাবর উঠতে বাধ্য হয় আর তনুভবনের সময় জলের উপরিতল নেমে আসবে সমুদ্রের জল পাড় থেকে হঠাৎ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবে, জলতল কমে আসবে। সুনামির বিশাল ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ার আগে সমুদ্রপাড়ের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেন।

যেহেতু বিপুল পরিমাণ শক্তির কারণে এই তরঙ্গের সৃষ্টি, তাই এক একটি ঘনীভবন ও তনুভবনের পর্যায় অতি দীর্ঘ হয়। ফলে সুনামি ঢেউ-এর একটির থেকে অপরটির মধ্যে মাঝসমুদ্রে সময়ের দীর্ঘ ফারাক থাকে। কিন্তু একেবারে শেষে পাড়ের কাছাকাছি এসে তরঙ্গের যে ঘনীভবনটি হয়, সেখানে আগের তুলনায় অনেক সীমিত পরিমাণ মাধ্যম (জল) থাকলেও ক্রিয়াশীল শক্তি প্রচুর হওয়ায় তরঙ্গের উচ্চতা বিশাল হয় কিন্তু বিস্তার বেশি হতে পারে না। ঘন ঘন ঢেউ আছড়ে পড়ে।

অবশেষে শক্তি ও কার্যের পারস্পরিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ শক্তি সমুদ্রপাড়ে এসে নিচের ভূপৃষ্ঠে ধাক্কা মারে। নিউটনের তৃতীয় গতিশক্তি অনুসারে পাড়ও সমমানের কিন্তু বিপরীত বল প্রয়োগ করে। ফলে নানা প্রকারের রৈখিক ও অরৈখিক (Linear & non linear) wave pattern-এর জন্ম হয়।

এই বলের দুটি উপাংশের (component-vertical & horizontal) মধ্যে একটি (vertical) পুনরায় ওই সময় (রৈখিক এবং অরৈখিক) তরঙ্গ সৃষ্টি করে পূর্ব-আগত তরঙ্গের সাথে সমাপতিত (Superposed) হয়ে তরঙ্গের উচ্চতা (amplitude) বৃদ্ধি করতে পারে কিংবা সমস্ত শর্তগুলি মিলে গেলে অনুনাদ (resonance) সৃষ্টি করে ঢেউ-এর উচ্চতা আরও বাড়াতে পারে। বলের অপর উপাংশ (horizontal) নিচের দিকে মাধ্যমকে টেনে আনে।

এই কারণে সুনামির (সমুদ্রপাড়ে ভূআলোড়নের ফলে জলোচ্ছাস) ক্ষেত্রে খুব উচ্চতাবিশিষ্ট (১০ থেকে ৩০ মিটার অবধি) ঢেউ পাড়ে এসে আঘাত করে।

ভূকম্পজনিত তরঙ্গশক্তি যেহেতু বিপুল শক্তিসম্পন্ন এবং বিশাল সমুদ্রে হাজার হাজার কিমি পেরিয়ে আসার সময় শক্তিক্ষয় করে এলেও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন থাকে। ঢেউ পাড়ের দিকে এগিয়ে আসার সময় ভূপৃষ্ঠের মাটি, বালি, পাথরের সাথে সংঘর্ষে কিছু পরিমাণ গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে তরঙ্গের গতিশক্তি কমে যায়। একটি সূত্র $v^2 = gd$ (v = তরঙ্গের গতিবেগ, g = অভিকর্ষজ তরঙ্গ এবং d = জলের গভীরতা) অনুসারে d অর্থাৎ জলের গভীরতা কমার সাথে সাথে তরঙ্গের বেগ কমতে কমতে শূন্য হয়। ভূমিকম্পের মাত্রা, গভীরতা এবং চ্যুতির প্রকৃতি, উৎসস্থল থেকে পাড়ের দূরত্ব, সমুদ্রপাড়ের নতি (gradient) এবং ভূতাত্ত্বিক গঠনের (bathymetry) উপর সুনামির উচ্চতা ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে।■

আগামী সংখ্যার প্রশ্ন ঃ

"বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান থাকে। এর মধ্য থেকে শুধুমাত্র অক্সিজেনকে কিভাবে মানুষ পৃথক করে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায়?"

সমীক্ষা ঃ

রাজমহলের লালমাটিয়া খনিতে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু কেন?

গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যে ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ ঝাড়খন্ডের গোড্ডা জেলার অন্তর্গত রাজমহল কয়লা খনিতে মাটি ধ্বসে বহু শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা এই খবর সকলেরই জানা।

আমাদের অনুসন্ধানে উঠে আসা তথ্যগুলিকে সামনে রেখে আমরা আলোচনা করতে চাইবো যে ২০১৬ সালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের মাত্রা কী এরকম যে কয়লা খননের জন্য অকাতরে এত প্রাণ চলে যাবে? নাকি 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী হচ্ছে সেখানেই রয়েছে দুর্ঘটনা (বাস্তবে ঘটনা) ঘটার বস্তুগত অবস্থা?

রাজমহল প্রোজেক্ট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিঃ (CIL) এর শাখা ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস্ লিঃ (ECL) কোম্পানীর প্রজেক্ট। এই রাজমহল প্রজেক্ট এর লালমাটিয়ায় একটি খোলামুখ খনি (Open cast mines-OCP) থেকে কয়লা উত্তোলন করা, Over burden (O.B)-handling অর্থাৎ কয়লা স্তরের উপরের মাটি, বালি-মাটি-পাথর সরানো এবং উত্তোলিত কয়লা ECL এর ডিপো পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য প্রাইভেট কোম্পানী মহালক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজেস কে ঠিকা দেওয়া হয়। কয়লা শিল্পের বিষয়ে ওয়াকিবহাল যাঁরা তাঁরা জানেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, লৌহ-ইস্পাত, সিমেন্ট সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানীগুলিকে কয়লা উত্তোলনের অধিকার দেবার মাধ্যমে সরকারের তরফে বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রায় বিশ বছর পূর্ব থেকে। এধরনের খনিকে Captive mines বলে। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার বানিজ্যিক ভাবে কয়লা উত্তোলন ও বিক্রি করার জন্য বেসরকারী কোম্পানীগুলির হাতে খনি সম্পদ তুলে দেবার প্রক্রিয়ায় এগোনোর পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ব কয়লা কোম্পানীগুলি বিভিন্ন লাভজনক কয়লাখনিগুলি থেকে কয়লা উত্তোলন ঠিকাদারী সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিচ্ছে। এগুলিকে বলা হয় Patch (প্যাচ)।

২৯শে ডিসেম্বর যে খনিটিতে দুর্ঘটনা ঘটে তা 'মহালক্ষ্মী এন্টার প্রাইজেস' কে ঠিকায় দেওয়া হয় ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ। আউট সোর্সিং (প্যাচ) করা খনিগুলির প্রযুক্তিগত মানদন্ড ঠিক করে রাষ্ট্রায়ত্ব CMPDIL। খনন কার্যের পরিকল্পনা DGMS (ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মাইনস সেফটি) দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে রেখে সর্বত্র কাজ করা হয় – আউটসোর্সিং প্যাচগুলিতে যা

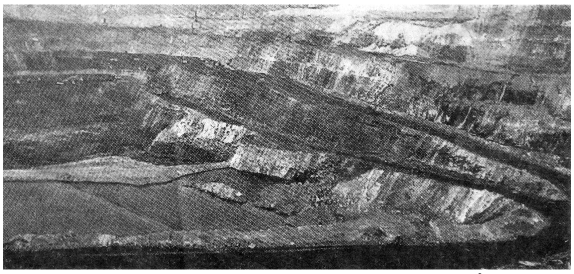

রাজমহল প্রজেক্টের এই খনিতেই ২৯শে ডিসেম্বর দুর্ঘটনা ঘটে

পৌঁছয় চরমে, ঠিকাদার কোম্পানীগুলি অতি মুনাফা লুটে নেবার পরও কোল কোম্পানীগুলির উৎপাদন খরচ (নিজস্ব বিভাগীয় খনিগুলির তুলনায়) কম হয় এর প্রধান কারণ হল আউটসোর্সিং প্যাচগুলিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরী বাবদ ব্যয় অনেক কম।

দেখা গিয়েছে এই অঞ্চলে ভূস্তরের নিকটবর্তী কয়লাস্তরগুলি অনেক পুরু। যেমন মহালক্ষ্মী প্যাচ এর ক্ষেত্রে ভূমিস্তরের ৫০-৬০ মিটার গভীরতায় প্রায় ৫০ মিটার পুরু কয়লার সীম রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ট্রিপিং রেশিও (কয়লা ও পাথরের স্তরের অনুপাত) প্রায় ১ঃ১।

[প্রকৃতপক্ষে কয়লার সীমগুলি এরকম অনুভূমিক থাকে না। এই অঞ্চলের এর নতি ০-১০° ডিগ্রির মধ্যে। একটানা সীমের মধ্যে স্টোন ডাইকের (পাথর-ডলেরাইট বা ল্যাম্প্রোফায়ার) জন্য বাধাপ্রাপ্তও হয়। অর্থাৎ স্ট্রিপিং রেশিও নির্দিষ্ট হয় না সমগ্র সীম জুড়ে।]

বর্তমান মহালক্ষ্মী প্যাচের সীমটি'র (কয়লাস্তর) মধ্যে বড়মাপের একটি ফল্ট বা চ্যুতি পূর্ব থেকেই আছে। এর উপরের অংশে (Upthrown side) ২০০৬-০৭ এ ECL এর দ্বারা [যাকে বলা হয় departmental বা বিভাগীয়] সম্পূর্ণ কয়লা উত্তোলন করা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই অংশটি ডিকোল্ড (কয়লা নিঃশেষিত)। ফল্ট এর নীচস্থ কয়লা সীমটি প্রায় ৬০ মিটার গভীরে অবস্থান করছে। এটিকে Downthrown side বলা হয়। OCP-র হিসাব অনুযায়ী এটি ডিপ মাইনিং। Downthrown side এ খনন কার্য চালানো শুরু হয় **অক্টোবর ২০১৫** তে। যার Over burden - ডিকোল্ড Upthrown side এর উপর জমা করা হচ্ছিল। যার সোজা অর্থ হল ফল্ট এরিয়ার উপর O.B জমা (dump) করা হচ্ছিল।

OCP মাইনিং এর ক্ষেত্রে শেষ থেকে কয়লা কাটা শুরু হয়। এক্ষেত্রে শেষ বলতে যে পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা গিয়েছে (XY অঞ্চল)। জানুয়ারী ২০১৬ তেই OB ডাম্প অস্থির হয়ে পড়ে। ভূস্খলন শুরু হয়। ফাটল দেখা দিতে থাকে। এই সমস্যা এত বড় আকার ধারণ করে যে এপ্রিল ২০১৬ তে ডাম্প সরানোর (পরিভাষায় যাকে বলে ওভার বার্ডেন রিহ্যান্ডলিং) সিদ্ধান্ত গৃহিত

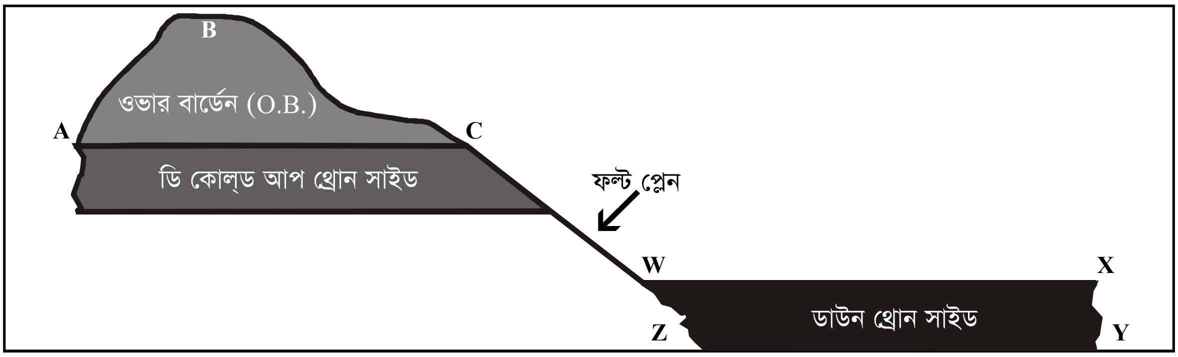

হয়। মনে রাখতে হবে কোম্পানীর দৃষ্টিকোণ থেকে ওভার বার্ডেন রিহ্যান্ডলিং কখনোই কাম্য নয়। কারণ একবার ও বি সরানোর পর রিহ্যান্ডলিং-এর খরচ বাস্তবে অনুৎপাদক ব্যয়। কোম্পানীর বোর্ড স্তরেই কেবল এর অনুমোদন দেওয়া হয়। মহালক্ষ্মী প্যাচ এ সমস্যা এতই গভীর ছিল যে ওভার বার্ডেন রিহ্যান্ডলিং- সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এই ওভার বার্ডেন রিহ্যান্ডলিং-এর ঠিকাও মহালক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ কেই দেওয়া হয়। সুতরাং এপ্রিল ২০১৬ থেকে একদিকে ক্রমাগত ব্লাস্টিং করে WXYZ অংশ থেকে কয়লা উত্তোলন আর ABC অংশ থেকে ওভার বার্ডেন পুনরায় অন্যত্র সরানোর কাজ একসঙ্গে চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, যে উপায়ে ধাপ কেটে কেটে (পরিভাষায় যাবে বলে বেঞ্চ) OCP থেকে কয়লা তোলা হয় একইভাবে উপর থেকে ওভার বার্ডেন পুনরায় সরানো হয়।

ঘটনা ঘটার অন্ততঃ ছ'মাস আগে থেকেই শ্রমিকরা ক্রমাগত ভূস্খলনের বিষয়ে মহালক্ষ্মী কোম্পানী ও ই সি এল-এর আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানাতে থাকেন। কিন্তু তবুও ও বি রিহ্যান্ডলিং-এর সাথে সাথে Downthrown side থেকে কয়লা উত্তোলন করা হতে থাকে। কারণ ই সি এল-এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে মহালক্ষ্মী প্যাচের দৈনিক ১৫,০০০ টন উৎপাদন আবশ্যক! সংবাদে প্রকাশ ঘটনার দিন মাটি ধ্বসে যাবার হার বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক কর্মচারী অভিযোগ জানানোয় সাইট ম্যানেজার কর্ণপাত করেননি। অনুসন্ধানে দেখা যায় সকাল ১১.৩০ নাগাদ ও বি ডাম্প এ সৃষ্টি হওয়া ফাটলে বারুদ ভরে ব্লাস্টিং করানো হয় আলগা মাটি সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফাটল আরও গভীর হতে শুরু করে। এই অবস্থায় ই সি এল-এর কর্মরত সুপার ভাইজার ও মাইনিং সর্দার Downthrown side এ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তার খবর পেয়ে ম্যানেজার সেখানে পৌঁছন এবং Downthrown side এ মহালক্ষ্মী সুপারভাইজারদের সাথে কথা বলেন। কী কথা বলেন তা আর কোনদিন জানা যাবেনা। কারণ ঐ তিনজন মাটির স্তূপে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছেন। আই এস এম ধানবাদ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ঐ ম্যানেজার তাঁর বয়ানে জানিয়েছেন Downthrown side এ উৎপাদন বন্ধই ছিল কিন্তু ও বি ডাম্প-এ কোন সমস্যা না থাকায় রিহ্যান্ডলিং-এর কাজ চলছিল। 'বি' চিহ্নিত অবস্থানে কর্মরত ই সি এল-এর ওভার ম্যান জানিয়েছেন বিকট শব্দে দ্বিতীয় শিফটে সন্ধ্যে ৭.১০ মিনিট নাগাদ ১৫ সেকেন্টের মধ্যে ৩০০ মিটার×১৫০ মিটার এলাকা জুড়ে সমগ্র ও বি ডাম্প ধ্বসে গিয়ে Downthrown side এ কয়লার সীমটিকেও দুমড়ে দিয়েছে। ধ্বসে যাওয়া মাটির আয়তন ৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটার!

ওপেন কাস্ট কয়লাখনিতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনার সাথে সাথে মহালক্ষ্মীর শ্রমিক কর্মচারীরা প্রাণ হাতে করে ডাম্পার-ডোজার-পোকল্যান-হাইভা নিয়ে মাটি সরিয়ে সহকর্মী সাথীদের উদ্ধারে পাগলপ্রায় চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর প্রতিটি দুর্ঘটনায় ঘটে অর্থাৎ ই সি এল ও ঠিকা সংস্থা মহালক্ষ্মীর আধিকারিকরা নিমেষের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। হিসাব অনুযায়ী মহালক্ষ্মী সংস্থায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করতেন, যারা মূলত পোকল্যান-হাইভা ও ডোজার চালক। গাড়ীর সংখ্যা গুনে কোম্পানী ও সরকার ঘোষণা করেছে (১২টি টিপার ৬টি পোকল্যান ও ১টি ডোজার – যা মাটির স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল)-২৩ জন মৃত। যার ১৮টি শবদেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। এই মৃতদের 'দায়' নিয়েছে মহালক্ষ্মী (৫ লাখ করে), ই সি এল (৫ লাখ করে) আর ঝাড়খন্ড সরকার (২ লাখ করে)। অর্থাৎ ১২ লাখ করে দিয়ে হাত পরিষ্কার।

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হচ্ছে ৬০-৭০ জন নিখোঁজ। এই সংবাদের পুষ্টি হওয়া দূরুহ কাজ। কারণ হাজিরা নাকি হতো কাগজে! সেই কাগজে নামের পাশে ✓ না × - সেটি মাটির নীচে থেকে উঠে আসবেনা। কারণ হাজিরা বানাতো মহালক্ষ্মীর যে সুপারভাইজার সে-ই আর কোনদিন উঠে আসবে না।

ঘটনা দৃষ্টে সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ই সি এল-এর এক পদাধিকারী তাৎক্ষনিক আবেগে বলে ফেলেছেন – 'এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় মার্ডার-হত্যাকান্ড'! ■

সংগঠন সংবাদ ঃ

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ’র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

বিভিন্ন অঞ্চলে ইউনিট সম্মেলনের পর গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ ‘বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ’র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রকাশ্য অধিবেশন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনী, বিজ্ঞানীদের ছবি ও মতামত-এর নানা রঙের পোস্টারে হল ছিল সুসজ্জিত। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ এবং নানা সহযোগী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, গণতান্ত্রিক সংগঠন-এর প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। প্রগতিশীল সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, স্লাইড শো-র মাধ্যমে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র প্রদর্শনী এবং সংগঠনের, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতামত দানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনকক্ষ ছিল উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর। ঐদিনই সংগঠনের মুখপত্র সমীক্ষণের ওয়েব সাইট প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন কক্ষ ছিল কাণায় কাণায় পূর্ণ।

সকল বক্তারাই পেশ করা দলিলটি নানা আলোচনা ও প্রস্তাব রেখে সমৃদ্ধ করেছেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ’র প্রতিনিধি বলেন “নীতিগত দিক থেকে আমরা একই মনোভাবাপন্ন। উভয়ে উভয়ের সাথে সবসময় সহযোগিতামূলক সম্বন্ধে আবদ্ধ। আমাদের রাজ্যেও সমীক্ষণের ভাল পাঠক তৈরি হয়েছে। এরাজ্যেও আমাদের মুখপত্র ‘অন্বেষণে’-র অনেক পাঠক আছেন। এখানকার অনুশীলন থেকে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী অঞ্চলে কৃষকদের পোকা লেগে ফসল নষ্ট হওয়ায় তাদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনের শিক্ষা আমরা কাজে লাগানোর প্রয়াস নেব।” বক্তা ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমজীবী সাধারণ জনতাকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, স্বাস্থ্য-শিক্ষার দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করতে, অলৌকিকবাদ, জ্যোতিষবাদ ইত্যাদির ভন্ডামির মুখোস খুলতে কি ধরণের ধারাবাহিক ভূমিকা রেখে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন।

শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা দলিলের ব্যাখ্যাকে সমর্থন জানিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সাংগঠনিক অনুশীলনের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার এখানে পেশ করা হচ্ছে –

“‘বিজ্ঞান মনস্ক’, পশ্চিমবঙ্গ’র দ্বিতীয় সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের জানাই সংগ্রামী অভিবাদন! যে সকল দার্শনিকদের অক্লান্ত প্রয়াসে মানুষ অজ্ঞতার জগৎ থেকে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছে এবং যে সকল বিজ্ঞানীর অকুতোভয় ও অধ্যবসায়ী প্রয়াসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বিজ্ঞানকে বিকশিত করার আন্দোলনে সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত করার আন্দোলনে এবং সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁরা অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগঠনের প্রতিবেদন পেশ করছি।

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রে চলছে এক চিরস্থায়ী সংকট। এই উৎপাদন সংকটের মূল কারণ বাজারের চাহিদার তুলনায় পণ্য সামগ্রির উৎপাদন অতিরিক্ত। পণ্যর চাহিদা সৃষ্টি হয় ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা। জনসংখ্যার বিশাল অংশ তথা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিম্ন অথবা মাঝারি মানের। যেহেতু এরাই উৎপাদিত পণ্য সামগ্রির মূল ক্রেতা তাই এদের ক্রয়ক্ষমতা অতিকম বা যথেষ্ট নয় বলে উৎপাদিত পণ্য বাজারে অতিরিক্ত। এই কারণে পুঁজিবাদী যুগের এই উৎপাদন সংকট হল অতি উৎপাদনের সংকট। অতীতে এই সংকট ৫ বা ১০ বছর অন্তর ফিরে ফিরে এলেও বর্তমানে তা চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। দুনিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণী বাণিজ্যিক এবং সামরিক যুদ্ধের মাধ্যমে এই সংকট থেকে পরিত্রাণের প্রয়াস চালায়। এতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির সংখ্যা হ্রাস পায়, পুঁজি ও উৎপাদনের অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভবন হয়; উৎপাদন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী মুদ্রানীতি তথা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমানে অচল প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। মাত্রাছাড়া শোষণ প্রক্রিয়া জারি করে, উৎপাদন ক্ষেত্রের আরও কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভিযোজন ঘটিয়ে তাকে টিঁকিয়ে রাখার মরিয়া প্রয়াস চলছে।

এর ফলে একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কোটি কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হচ্ছেন, শোষণের মাত্রা বাড়ছে, বাড়ছে বেকারত্ব, বাড়ছে অনিশ্চয়তা। অন্যদিকে সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক বন্টনের সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিমূহুর্তে মূর্ত হয়ে উঠছে। আগামী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমজীবী জনতা যাতে তার সংগ্রামের বিকাশ ঘটাতে না পারে তাই

পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা ইত্যাদির নামে প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রামে নামিয়ে সমাজ প্রগতির পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে।

আমরা যখন আমাদের দ্বিতীয় সম্মেলন করছি তখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলছে এক ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশ। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র চলছে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা ইত্যাদির নামে ভয়াবহ হানাহানি আর সন্ত্রাস। এতে বলি হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, বেঘর হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন কয়েক কোটি মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অস্পৃশ্যতা নামক কলঙ্কের হাত থেকে সমাজ মুক্ত হয়নি। ভারতে যেমন প্রবল হয়েছে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের উপরে অত্যাচার তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা এবং ইউরোপে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার আর নির্যাতন। প্রায় সর্বত্রই আদিবাসী জনজাতির উপর তথাকথিত সভ্য নাগরিক সমাজের নিপীড়ন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের উপর নির্যাতন। সর্বত্রই ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষার নামে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পরমত অসহিষ্ণুতার বিষাক্ত বাষ্প সর্বত্র ধূমায়িত হচ্ছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক এবং প্রগতিশীল মানুষদের নির্বিচারে হত্যা, কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। বিজ্ঞানভিত্তিক এবং তথাকথিত অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে যাঁরাই মুখ খুলছেন সর্বত্র ধর্মবাদীরা তাঁদেরই টার্গেট করছে। প্রতিটি দেশেই যে সকল বুদ্ধিজীবীরা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার চাইছেন তাঁদেরই লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। বোকো হারামের কার্যকলাপ এর একটি উদাহরণ। এছাড়া এই মৌলবাদীদের রয়েছে জনসংখ্যা কমানোর টার্গেট। যাঁরাই বর্তমান অন্ধকারময় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলবেন তাঁদের উপর হামলা করো। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মুখোশ পড়া প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই আমরা একই ছবি দেখছি।

কোনো একটি বিশ্বাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ ক'রে তার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাকে দমন করাই মৌলবাদী আগ্রাসন। বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিশক্তিকে দমন করতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেশে দেশে শাসকশ্রেণী গড়ে তুলছে, লালন পালন করছে এই মৌলবাদী শক্তিগুলিকে। বিশ্বের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিসংস্থাগুলি এদের বিপুল অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। মাঝে মধ্যে এরাই আবার বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে তাদেরই দিকে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে টিঁকিয়ে রাখতে, শোষিত মানুষের সংগ্রামকে বিপথে চালাতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নৃশংস হামলায় দেশে দেশে শাসকশ্রেণী হয় এক পক্ষ নিচ্ছে নয়ত থাকছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো ধর্মবাদীরাই পরমত সহিষ্ণু নয়। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এবং অপর ধর্ম ও ধর্মবলাম্বীদের হীন প্রতিপন্ন করতে শেখায়। শোষণমূলক সমাজের সূচনাকাল থেকে আজ অবধি আমরা এই ইতিহাসই প্রত্যক্ষ করে আসছি। তাই শ্রেণীশোষণমূলক ব্যবস্থা জারি থাকবে আর মৌলবাদের অবসান হবে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে এই ভাবনা অলীক কল্পনামাত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসান ছাড়া এই অন্ধত্ব থেকে সমাজ মুক্তি পেতে পারে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বিজ্ঞানের প্রকৃত আবিষ্কারগুলি তেমনভাবে এগুতে পারছে না। বিশ্বের কোথাও পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী মুনাফাদায়ী ক্ষেত্র ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে উৎসাহ দিচ্ছে না। সেই সকল গবেষণাক্ষেত্রেই অবাধে পুঁজিবিনিয়োগ হচ্ছে যেসকল গবেষণা পুঁজিপতিশ্রেণীকে আরও মুনাফা দিতে পারে যেমন যুদ্ধাস্ত্র এবং পণ্যের আধুনিকীকরণ। প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের জন্য গবেষণাক্ষেত্রে তথা আশু মুনাফাদায়ী নয় এমন ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রায় কোনো রাষ্ট্রই উৎসাহী নয়। তবুও অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 'মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান' এই পর্যায়ের এক কালজয়ী ঘটনা।

মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে, আরও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা শতবাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেও জনজীবনে আমরা উল্টো ছবি দেখছি। জনজীবনে আজও ছেয়ে আছে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অপুষ্টি-অনাহার, ঈশ্বরবাদ-ধর্মবাদ, কুসংস্কার-অপবিজ্ঞানের কালো অন্ধকার। পৃথিবীর মানুষের চাহিদার তুলনায় বহুগুণ খাদ্যশস্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার প্রয়োগে উৎপন্ন হলেও বিশ্বের ১০০ কোটির বেশি মানুষ আজও থাকেন অনাহারে, ২০০ কোটির বেশি মানুষ অর্ধাহারে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল, পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোল অথবা উড়িষার কালাহান্ডির ঘটনা এর খন্ডচিত্র মাত্র। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির সুযোগ আপামর শ্রমজীবী মানুষের নাগালের বহু দূরে পড়ে আছে। এই সমাজে 'পয়সা আছে যার আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার একমাত্র অধিকার তার'। তাই দেবস্থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা, তাবিজ-কবজ, ওঝা-বদ্যি, জ্যোতিষদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে রকেটের গতিতে।

শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় পাঠ্যসূচীতে বহুকাল ধরে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি অবাধে পঠন

পাঠন চলছে। বর্তমানে পাঠ্যসূচীতে অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি বেশি বেশি করে ঢোকানো হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের, মত অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসে রাষ্ট্রীয় মদতে অপবিজ্ঞানের প্রচার হচ্ছে। সরকার দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেছে। মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য প্রাইভেট নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর অধিকাংশ মানুষের জন্য পরিকাঠামোহীন, অরাজকতাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যের ন্যায় শিক্ষাও এখন দামী পণ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নত আধুনিক শিক্ষায় প্রবল আগ্রহ থাকলেও তা ক্রয় করার ক্ষমতা অধিকাংশের নেই। নেই শিক্ষান্তে কাজের সুযোগ।

এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নত অবস্থায় সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার আগ্রহ, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে না? অবশ্যই বাড়ছে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে চান সাগ্রহে। ধর্মীয় শিক্ষা নয় মানুষের আগ্রহ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রমজীবী জনসাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফল ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকায় তুক্‌তাক্‌, তান্ত্রিক, পীরবাবা বা ধর্মস্থানে যান শিকড়-বাকড় পড়েন। আধুনিক চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের সুফল হাতের কাছে পেলে তাকেই গ্রহণ করেন। সাপে কামড়ালে, হাসপাতাল সামনে পেলে ওঝার কাছে যান না।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের সংকট গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকায় এই সমাজে অধিকাংশ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা বাড়ছে, কর্মক্ষেত্রে একসময় যাদের স্থায়িত্ব ছিল তারা স্থায়িত্ব হারাচ্ছেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মানুষেরা, যারা বিজ্ঞান চেতনা এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত তারাও এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে সমাধানের রাস্তা না পেয়ে অলৌকিকত্বের, কুসংস্কারের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, ধর্মগুরুর কাছে ছুটছেন। আংটি, তাবিজ, কবজ-এর ব্যবসা বাড়ছে। বর্তমান যুগে শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতিরা সাধারণের মধ্যে অলৌকিত্বের প্রচার বাড়াচ্ছেন। প্রতিটি অত্যাধুনিক হাসপাতালে কর্তৃপক্ষই মন্দির-মসজিদ-গির্জা বানিয়ে দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। সাপের চিকিৎসা হয় যে হাসপাতালে তার পাশেই 'মা-মনসা'র মন্দির গড়ে উঠছে। সুতরাং সমাজ থেকে ধর্মবাদ-ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি ভাববাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে জনতাকে বিজ্ঞান মনস্ক করতে সমাজের তৃণমূল স্তরের কাছে পৌঁছাতে হবে। বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু ধর্মবাদ-অলৌকিকবাদে আচ্ছন্ন মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার তুলনায় বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয় যে মানুষজন আমাদের তাদের মধ্যেই বেশি বেশি করে যেতে হবে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান না করে একতরফাভাবে মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। 'ভূ-উষ্ণায়ণের জন্য মনুষ্যকার্যকলাপই একমাত্র দায়ী' এই মিথ্যা পরিবেশবাদী স্লোগানের আড়ালে জল-জঙ্গল-জমির উপর একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য বিস্তার চলছে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় করা হচ্ছে বাধাদান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কার এবং অগ্রগতির পিছনে সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। মুনাফাদায়ী ক্ষেত্র নয় বলে ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা সহ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর গবেষণা ও প্রযুক্তির বিকাশকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। এর বদলে মুনাফাদায়ী ডিজাসটার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রকেই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মদতে ঈশ্বরবাদ, ধর্মবাদ, কুসংস্কার, জ্যোতিষবাদ, অপবিজ্ঞানের প্রচার প্রসার হচ্ছে। ছদ্ম ধর্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মবাদীদের মদত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন রাষ্ট্রকে অসহনীয় করে তুলছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলন থেকে পৃথক করা যায় কী? এর একমাত্র উত্তর হল না। 'বিজ্ঞান মনস্ক' তার জন্মলগ্ন থেকে এবং বিশেষ করে ২০১৩ সালের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন থেকে এই প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরেছে এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সাধ্যমত অংশগ্রহণের প্রয়াস রাখার অঙ্গীকার করছে।

বর্তমানে যেসব বিজ্ঞান সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে তাদের বড় অংশের প্রধান ঝোঁক হল সংস্কারবাদী অর্থাৎ সমস্যার মূল উৎসগুলির নিরসন না করে কেবলমাত্র সংস্কার করে সমস্যা দূর করার নীতির ভিত্তিতে চলা। কুসংস্কার এবং ঈশ্বরবাদের মূলভিত্তি যে বিদ্যমান সমাজের গভীরে প্রোথিত, তারা এই দিকটিকে উপেক্ষা করেন। ফলে বিজ্ঞান আন্দোলন একটি বদ্ধজলায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

এর থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জে বি এস হ্যালডেন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা সমস্যা থেকে উত্তরণের রাস্তা হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান রেখেছিলেন। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং প্রকৃতিকে জয়

করার মানবজাতির আকাঙ্খা পূরণ মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ছাড়া সম্ভব নয়।

বিগত সম্মেলনের পর সদস্যসংখ্যা এবং কাজের ক্ষেত্রে সামান্য বিকাশ হয়েছে। সমীক্ষণ-এর প্রচার বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে খরচও। সাংগঠনিক দুর্বলতায় আমরা সব কয়টি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি। আমরা এই পর্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে যৌথ কাজের কথাবার্তা এবং যৌথসভায় থেকেছি। আমাদের সাথে অধিকাংশ বিজ্ঞান সংগঠনের নীতিগত পার্থক্য মূলত বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের অধীনে আনার প্রশ্নে। মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমরা তাদের সাথে বার্তালাপ এবং যৌথ কার্যক্রমের প্রয়াস জারি রেখেছি।

অনুশীলনের মূল্যায়ন ও আগামী কতর্ব্য

১) পুঁজিবাদী সমাজে শাসকশ্রেণী শ্রমজীবী জনতাকে ঈশ্বরবাদ, ধর্মবাদ তথা সামগ্রিকভাবে ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে রাখার নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জনতার মধ্যে ভাববাদী দর্শনের পরিবর্তে বস্তুবাদী তথা বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, বিজ্ঞান মনস্ক করা। এই কাজের দুর্বলতা দূর করার একমাত্র উপায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অধ্যবসায়ী অনুশীলন।

২) শুধু বিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে, সেমিনার করে, ভাষণ দিয়ে মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করা যায় না। এর জন্য চাই জনতার সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং তাদের দৈনন্দিন সমস্যা ভিত্তিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া। তাই বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সাথে জনতার সামাজিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

৩) প্রত্যেক সদস্যকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক-সামাজিক আচরণে অলৌকিকবাদ-ঈশ্বরবাদ-ধর্মবাদ ইত্যাদির প্রভাবমুক্ত হতে হবে। তবেই আমরা অন্যকে বিজ্ঞান মনস্ক করতে পারব।

৪) শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক এবং বর্তমান শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রচার ও বিভ্রান্তির স্বরূপ নিয়মিত উন্মোচন করে কর্মীবাহিনী ও জনতার চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে।

৫) নিয়মিত শিক্ষা শিবির করতে হবে।

৬) সমীক্ষণের নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখতে হবে এবং সংগঠনের ইংরাজি মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে।" ■

জেলায় জেলায় বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মসূচী

বিগত সময় বিজ্ঞান মনস্ক রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী, বিজ্ঞান সচেতনতামূলক প্রদর্শনী, বিজ্ঞানের প্রদর্শনী এবং বইমেলায় অংশ নিয়েছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এখানে রাখা হচ্ছে।

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা সদর শহরে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ রেডক্রশ সোসাইটি হলে ছাত্রদের নিয়ে কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচনকারী এক আলোচনা স্লাইড সো-র মাধ্যমে করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 'প্রহিবিটেড' নামক পত্রিকার পক্ষ থেকেও তাদের পত্রিকা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখা হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৬, ভগৎ সিং-র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলার **বনগাঁ** শহরে পূর্ব প্রান্তে অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্র মঞ্চ'র আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুসংস্কারের স্বরূপ এবং সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি শীর্ষক স্লাইড শো প্রদর্শন করা হয়।

কলকাতা ঃ ৩০-৩১শে অক্টোবর দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার **ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের পোড়া অশ্বত্থতলায়** কালিপূজার সময় বিজ্ঞানের পোস্টার প্রদর্শনী হয় এবং সমীক্ষণের প্রচার হয়।

৯ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৬ **বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে** বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল হয়। প্রচুর উৎসাহী পাঠক বই সংগ্রহ করেন।

২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি ২০১৭ **বেহালা শখের বাজার** চন্ডীর মাঠের বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল হয়। এই স্টলগুলিতে সমীক্ষণের পাঠকরা উৎসাহ নিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ–মতামত দান করেন। স্টলে 'বিশ্বের কোন ধর্মবাদীরাই পরমত সহিষ্ণু নয়' এবং 'ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে' পোস্টার সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

৬-৭ই জানুয়ারি, **কলেজ স্কোয়ারের** মাঠে লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ'র মেলায় সমীক্ষণের স্টল হয়।

দার্জিলিঙ ঃ ২৬শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর **শিলিগুড়িতে** উত্তরবঙ্গ বইমেলায় সমীক্ষণের স্টলে পূর্বের মত পাঠকের সমাবেশ ও পত্রিকা বিক্রি ছিল আশাব্যঞ্জক।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ ৮ই নভেম্বর ২০১৬ জেলার ক্যানিং শহর সংলগ্ন **তালদি**-তে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী, সাপ নিয়ে আতঙ্ক ও মক্তি প্রসঙ্গে স্লাইড শো-র মাধ্যমে অনুষ্ঠান হয়।

৯ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৬, **সোনারপুরে** পূর্বের মত বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল হয়। এই বইমেলায় এবার প্রধান

আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান মনস্ক'র বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী। টানা ১০ দিন ধরে হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়ে আমাদের প্রদর্শনী দেখেন। বইমেলায় বাস্তবত এটাই হয়ে ওঠে প্রধান আকর্ষণ।

২৮শে ডিসেম্বর ২০১৬, সোনারপুর পার্শ্বস্থ গঙ্গাজোয়ারা গ্রামের **নয়াবাদে** বিজ্ঞান মনস্ক'র মডেল প্রদর্শন অনুষ্ঠান হয়।

গত ৩রা এবং ৪ঠা জানুয়ারি ২০১৭, সোনারপুর সংলগ্ন **বামনঘাটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের** ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মী ও স্কুলের ছাত্ররা বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন করেন।

২৪শে জানুয়ারি ২০১৭, সুন্দরবনের **পাথরপ্রতিমা** ব্লকের বরদাপুর মিলন বিদ্যাপীঠে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন ও স্লাইড শো হয়।

২৪-২৬শে জানুয়ারি পাথরপ্রতিমা ব্লকের নেতাজী সংঘে বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন, কুসংস্কার বিরোধী স্লাইড শো প্রদর্শন হয়।

২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পাথরপ্রতিমার মাধব নগর কলোনিতে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি ঐ ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণপুর কাছারি পাড়াতেও একই অনুষ্ঠান হয়।

বর্ধমান জেলা ঃ ১৩-২২শে জানুয়ারি জেলার **আসানসোল** শহরের বইমেলায় সমীক্ষণের স্টল পূর্বের মতই দেওয়া হয়।■

রিপোর্ট

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের দাবিতে গণআন্দোলনের সাথী বিজ্ঞান মনস্ক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ১নং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পদ্মের হাটের অধীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে মোমরেজগড়ে। ৩৫ বছর আগে স্থাপিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রর অধীন ১৪-১৫টি গ্রামের ২৫-৩০ হাজার মানুষ। এখানে আছেন ২ জন নার্সিং স্টাফ, ১ জন ফার্মাসিস্ট এবং একজন গ্রুপ ডি কর্মী। এখানে গত ১ বছর কোন মেডিকেল অফিসার বা ডাক্তার নেই। ৭ বছর আগে এটিকে ১০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে বলে সারি সারি ভবন নির্মাণ, বিদ্যুৎ-জলের ব্যবস্থা হয়। সারি সারি বেডও পাতা হয়। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে তা আজও চালু হয়নি। তবুও 'নেই মামার বদলে কানা মামা'-র কাছে যায় মানুষ। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনতে অক্ষম কমপক্ষে ৬০-৭০ জন মানুষ আজও নিরুপায় হয়ে এখানে আসেন। 'সান্তনা চিকিৎসা' হিসাবে কিছু মামুলি ওষুধ দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠান হয়, নয়ত ব্লক/মহকুমা/জেলা হাসপাতালে পাঠান হয়। ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা আর টি বি-র কফ পরীক্ষা ছাড়া কিছুই হয় না।

এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক সংগঠন 'সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি'-র স্থানীয় ইউনিট আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। অবিলম্বে সর্বক্ষণের ডাক্তার নিয়োগ, এটিকে ১০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা এবং অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবার দাবিতে প্রচার শুরু হয়। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-র স্থানীয় সদস্যরা এই আন্দোলনে যোগদান করে। আন্দোলন পরিচালন কমিটি গড়ে ওঠে। কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন এবং রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবের কাছে ন্যায্য দাবিগুলি তুলে ধরার।

৭টি গ্রামে লাগাতার প্রচারের পর প্রায় দুই হাজার মানুষের সাক্ষর সম্বলিত ডেপুটেশন দিতে যান প্রায় ১৫০ মানুষের মিছিল। আলোচনায় বি এম ও এইচ অক্সিজেন, স্ট্রেচার, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন এবং দু-চার দিন পর থেকেই তার বন্দোবস্তো হয়। কিন্তু সর্বক্ষণের ডাক্তার নিয়োগ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের দাবিপূরণে তার অসহায়তা ব্যক্ত করে দাবিপত্রটি তৎক্ষাণৎ সি এম ও এইচ এবং স্বাস্থ্যভবনে প্রেরণ করেন ই-মেল করে।

আন্দোলন পরিচালন কমিটি বিকালে স্থানীয় গোয়ালবেড়িয়া হাটে জনগণের সামনে ডেপুটেশনের সারার্থ তুলে ধরেন। ১৯শে অক্টোবর ২০১৬ কমিটির প্রতিনিধিরা সি এম ও এইচ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে (দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সদর হাসপাতাল) যান। দীর্ঘ আলোচনার পর সি এম ও এইচ জানান "ডাক্তার নিয়োগের প্রস্তুতি হিসাবে ইন্টারভ্যু চলছে। জয়নগর ১নং ব্লকে আবেদনপত্র জমা পড়লে আপনাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ হবে।" যদি আবেদনপত্র জমা না পড়ে তবে কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সি এম ও এইচ জানান "তবে অন্য ব্লকের ডাক্তার ঐ ক্ষেত্রে আমরা নিয়োগ করব। কিন্তু তিনি কাজে জয়েন না করলে কি হবে বলা কঠিন। কেননা ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। সরকারি চাকরি করতে তাদের আগ্রহ কম। বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোমে ডাক্তারদের ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য মাসে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেয়। সেখানে রাজ্য সরকার দেয় ৪৫ হাজার টাকা। আর ১০ শয্যার হাসপাতালের বিষয়টা সম্পূর্ণত স্বাস্থ্যভবনের বিষয়।"

২৮শে অক্টোবর স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকের সাথে

আলোচনায় তিনি জানান "বিষয়টি নিয়ে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেবে, আপনারা ২-৩ মাস পর খবর নেবেন।"

এরপর প্রায় ৪ মাস অতিক্রান্ত। ডাক্তার নিয়োগ হয়েছে কিন্তু ১০ শয্যার হাসপাতাল চালু করার জন্য কোন উদ্যোগ সরকার নেয়নি। সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি গ্রামীণ জনতাকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা এই সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে শিখেছে যে জরি-বুটি-তাবিচ-কবচ ইত্যাদি বুজরুকি ছেড়ে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার অধীনে আসতে শ্রমজীবী জনতার আগ্রহ প্রবল। তারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাই চায়। কিন্তু সেই অধিকার এই সমাজ; এই রাষ্ট্র দেয় না। অধিকার কেড়ে নিতে হয়, অধিকার লড়ে নিতে হয়। ■

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৩তম বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৩ই নভেম্বর, কাঁচড়াপাড়ার রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সকাল থেকে 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ হাজির হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিবর্তন ভট্টাচার্য তার রচিত চিঠি পাঠ করেন। তিনি বলেন কিছু পত্রপত্রিকা বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে ভূমিকা রাখলেও অন্য কিছু পত্রিকা বিজ্ঞান মনস্কতা বিরোধী লেখাই প্রকাশ করে বিজ্ঞান পত্রিকার নামে। দীপক কুমার দাঁ বলেন বিজ্ঞান মনস্কতা যার যার কাছে নিজের মত। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দও যেমন বিজ্ঞান মনস্ক ছিলেন, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও ছিলেন বিজ্ঞান মনস্ক। মণি ভৌমিক, আচার্য সুকুমার সেনও নিজের মত করে বিজ্ঞান মনস্ক ছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে দেবকুমার হালদার বলেন – বিজ্ঞান আন্দোলন করতে গিয়ে পূর্বসূরীদের অপরিসীম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাই বিজ্ঞান মনস্কতা কিছুতেই যার যার মত হতে পারে না। তিনি দীপক কুমার দাঁ-র বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ বা মণি ভৌমিকদের মত লোকেরা কিছুতেই বিজ্ঞান মনস্ক নন।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-র প্রতিনিধি বলেন – শুধু পত্রিকায় লিখে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার হয় না। হলসভায় শিক্ষিত, সচেতন মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের আলো নিয়ে গেলেই হবে না। প্রয়োজন সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ঘটানো। শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক আন্দোলনের পাশে থেকেই একমাত্র সেটা করা সম্ভব।

ভবানী প্রসাদ সাহু বলেন বিজ্ঞান কর্মীদের স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। তিনি তার সাম্প্রতিক চীন সফরের অভিজ্ঞতায় বলেন – সেদেশের মানুষ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে না। কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের ফলে ৯৪% শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত।

ডঃ গৌরব সাহা বলেন তাত্ত্বিক জায়গা থেকে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে আরও সচেতনতা গড়ে তোলা উচিৎ। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে ইঁটভাটা কিভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করে। মানুষকে জৈব চাষ নিয়ে বোঝান উচিৎ। তিনি বলেন "আক্ষরিক অর্থে বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া এবং সমাজে এক ঘরে হওয়া সমার্থক।"

এরপর বলেন কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম-এর ডঃ তপন দাস। তিনি বলেন বিভিন্ন ঘটনা সঠিকভাবে লেখার মাধ্যমে ছোট ছোট পত্রপত্রিকাগুলি ভালই ভূমিকা রাখে।

'পরিবেশ বান্ধব' সংগঠনের পক্ষ থেকে কল্লোল রায় বলেন "বিশ্বে নাস্তিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু মৌলবী বা পুরোহিতরা যেমন আকর্ষণীয়ভাবে তাদের কথা পেশ করে, আমাদেরও বিজ্ঞান ও নাস্তিকতার কথা তেমন আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করতে হবে।" তিনি ছোট পত্রিকাগুলির সমন্বয়ের প্রস্তাব রাখেন।

'ঝাড়খন্ড যুক্তবাদী সমিতি'-র শঙ্কর কর বলেন "বিজ্ঞান সংগঠনগুলির উচিত সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রচার করা, সর্বহারাদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াস নেওয়া। ভাববাদী ধারণার সাথে বিজ্ঞান আন্দোলনকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।"

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশ দাস বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাস বলেন এবং রচনাগুলি সকলের বোঝার মত করার কথা বলেন।

'পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন সায়েন্স ফোরাম' এর ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার বলেন "আমরা জনগণের মধ্যে সত্যিকারের বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচার করতে পারি নি। বিজ্ঞান কর্মীদের একটা সমন্বয় মঞ্চের প্রয়োজন।"

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' তপন সাহা বলেন "বিজ্ঞানের বিষয় মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ অনেক পুরানো। রামমোহন, বিদ্যাসাগররাও এই ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানকে ধর্মের মোড়কে প্রচার করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে লড়তে ছোট ছোট পত্রিকাগুলি আরও বেড়ে উঠুক।"

সুস্মিতা চৌধুরী বলেন "রামমোহন, ডিরোজিওরা যে প্রগতিশীল ধারার সূচনা করেন, পরবর্তী প্রজন্ম 'পরমত সহিষ্ণুতা'র মাধ্যমে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। উন্নাসিকতা থাকা বিজ্ঞান কর্মীদের কাছে কাম্য নয়।"

জলপাইগুড়ির 'সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব' এর ডঃ গৌতম

ঘোষ বলেন "ভারতবর্ষে বিজ্ঞান আন্দোলন নিরীশ্বরবাদী আন্দোলন থেকে পুরানো। ডেভিড হেয়ার বা অক্ষয় কুমার দত্ত-রা এই ধরণের আন্দোলন করতেন।"

বিজ্ঞান সাংবাদিক সুদীপ মিত্র বলেন "বিজ্ঞান পত্রিকা হিসাবে এখন বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং সোস্যাল মিডিয়াকেও গণ্য করতে হবে। সব ধরণের মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিৎ।"

এরপর আরও কয়েকজন বক্তা বক্তব্য রাখেন এবং তারপর বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পরিচালক এবং উপদেষ্টামন্ডলীর নাম ঘোষণা করা হয়। তারপর স্থানীয় যমুনা নদী কিভাবে ধ্বংস হয়ে চাষের ক্ষেত বনে যাচ্ছে তা নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়।■

ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের পঞ্চম কেন্দ্রীয় সম্মেলন

রাজধানী আগরতলার 'যক্ষ্মা নিবারণ সমিতি' হলে গত ২৮শে নভেম্বর ২০১৬, ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র পঞ্চম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন সম্পন্ন হল। গণসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয় সমাজের একদিকে প্রাচুর্য্য আর অন্যদিকে হাহাকার। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে উৎপাদন ক্ষমতা এমন স্তরে পৌঁছেছে যেখানে সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য বাজার থেকে কিনে ভোগ করতে হয় এবং বাজারে রয়েছে অসম ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ, তাই বাজারে সবকিছুর যোগান উৎবৃত্ত থাকা সত্ত্বেও সব মানুষ সামাজিকভাবে বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করতে পারছে না। অন্যদিকে পণ্যের মধ্যে জমে থাকা পুঁজি ফেরৎ না আসায় পুঁজিবাদ বহুকাল আগেই তার সাবেকি বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে এবং বর্তমান পুঁজিবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্র অভিমুখী একচেটিয়া পুঁজিবাদ। সামাজিক শ্রমের ব্যক্তিগত ফলভোগের এই পদ্ধতিকে সমূলে উচ্ছেদ করেই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সমাজের কাছে ফিরে আসবে।

এখন রাজ্য-দেশ তথা গোটা দুনিয়া জুড়ে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের নামে জনগণকে বিভক্ত করে সমাজের প্রগতির সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রয়াস চালাচ্ছে শাসকশ্রেণী। গোটা দেশের মত ত্রিপুরা রাজ্যেও শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এরপর রাজ্য জুড়ে বিগত সময়ের কাজের রিপোর্ট একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

এরপর জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধি প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রোৎসাহনে জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়ানোর বিরোধিতা করেন। রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতালে সাপে টাকা রোগীরা হাসপাতালে এলে প্রশিক্ষণের অভাবে চিকিৎসকদের আত্মবিশ্বাসহীনতার কথাও তুলে ধরেন।

নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিনিধি বলেন – এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের পরম্পরাগত বিশ্বাসগুলিকেই যান্ত্রিকভাবে ভাবতে শেখায়। ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ এই পরম্পরাগত যান্ত্রিকতাকে ভাঙতে শেখায়।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি প্রতিবেদনকে পূর্ণ সমর্থন করে বলেন – এই দুই সংগঠন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ। পুঁজিবাদ আজ তার প্রগতিশীলতাকে হারিয়ে বাজার সংকটে ভুগছে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের কিছু অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন। ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র মুখপত্র 'অন্বেষণে' থেকে বিজ্ঞান মনস্ক সমৃদ্ধ হয়েছে বলে তিনি জানান। ভবিষ্যতে অন্বেষণে প্রকাশে সর্বতোভাবে সহায়তা করার কথা জানান। দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি ইংরাজি মুখপত্র প্রকাশ করার বিষয়ও তিনি প্রস্তাব দেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একজন মেকী জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের স্বরূপ উন্মোচনকারী একটি সঙ্গীত – 'একটি থালায় চারটি রুটি' পরিবেশন করেন। এরপর বর্তমান সমাজের সংকট থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে বিভিন্ন গান-আবৃত্তি ও ভাষ্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান হয়।

ওইদিন রাজ্যে ধর্মঘট থাকা সত্ত্বেও সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। সম্মেলন কক্ষে বিগত দিনের কাজের ছবি, বিভিন্ন সমাজ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ছবি ও বাণীতে ছিল সুসজ্জিত।■

আগামী ২রা এপ্রিল সোনারপুরের সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউটে এবং ৯ই এপ্রিল বেহালায় দুপুর ২. ৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭. ৩০ অবধি বার্ষিক বিজ্ঞান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হবে। সেমিনারের বিষয়বস্তু –'স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালহকিকৎ এবং সমাধানের পথ'। বিতর্কের বিষয় – "প্রযুক্তিগত উন্নতি বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ" (সোনারপুর) এবং "কুসংস্কার টিঁকে থাকার কারণ মানুষের অজ্ঞতা" (বেহালা)। এছাড়া থাকবে পাঠকের মতামত, মডেল প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ২য় কেন্দ্রীয় সম্মেলন

সোনারপুর বইমেলায় বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী

পাথরপ্রতিমায় বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী

বেহালা বইমেলা

ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের পঞ্চম কেন্দ্রীয় সম্মেলন

বেহালা বইমেলা

সপ্তম বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖মার্চ ২০১৭ Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

প্রাণীজগতে রঙের বাহার

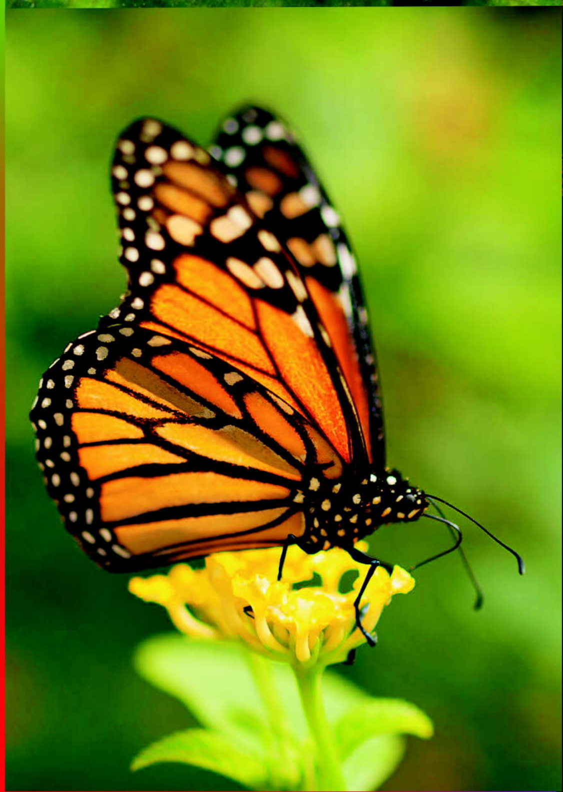

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email ঃ samikshan2009@gmail.com Website ঃ www.samikshan.com
সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা